পঞ্চম অধ্যায়

আশালতা সিংহের অন্যান্য গদ্য রচনা

আশালতা সিংহ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ছাড়া একটি নাটকের বই লেখেন যার নাম 'সুরের উৎস'। বিশ শতকের প্রথম দিকে সাহিত্যের আঙিনায় যখন খুব ধীর পদক্ষেপে আশালতা সিংহের আবির্ভাব হয় সে সময় নাট্যক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাট্যকাররূপে সু-প্রতিষ্ঠিত। এইসময় আরও পাওয়া যায় অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বিধায়ক ভট্টাচার্য, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশির কুমার ভাদুড়ী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মন্মথ রায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারদের। সর্বোপরি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো সাহিত্যের সর্ব-শাখাতেই সমানভাবে দীপ্তিমান ছিলেনই। এঁদের মাঝে সে সময় মহিলা নাট্যকার কজনকেই বা পাচ্ছি? তথাকথিত বুদ্ধিবৃত্তিতে পিছিয়ে পড়া জাত হিসাবে দু-একটি প্রেমের কিংবা ঘর-সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে দেখা ঘটনা নিয়ে যাও বা দু একটি গল্প-উপন্যাস তাঁরা রচনা করেছেন কিন্তু নাটক রচনার ধারেকাছেও যাননি। কেন লেখেননি তাঁরা নাটক?

আধুনিক সাহিত্যের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকতে মেয়েদের যে বেগ পেতে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। উনিশ-বিশ শতকের মহিলা সাহিত্যিকরা সাহিত্য উৎপাদনের দুনিয়াতে আসার আগেও পুঁজিবাদের আদলে তার পুনর্বিন্যাস ঘটে গেছে। উপন্যাস-গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছুতে হলে যেমন পত্র-পত্রিকা সম্পাদকের-প্রকাশকদের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় তেমনি নাটকের ক্ষেত্রে এসবের অতিরিক্ত দর্শক-মঞ্চ, মঞ্চের অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক এদের মধ্যস্থতার একান্ত আবশ্যক হয় — এসবের সুযোগ অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন চার -দেওয়ালের মধ্যে বন্দী তখনকার মহিলা কথাকার কোথায় পাবেন? তাই আমরা উনিশ-বিশ শতকে বিশেষ কোন মহিলা লেখিকা পাই-ই না যাঁরা নাটক লিখেছেন। আশালতা সিংহের সমসাময়িক যেসব মহিলা লেখিকারা নাটক লিখেছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, অনুরূপা দেবী, হেমলতা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, বাণী রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী বেশ কয়েকটি এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী দুটি নাটক লেখেন। অন্যান্য মহিলা নাট্যকাররা একটি করেই নাটক লেখেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর লেখা দুটি নাটক — 'সাতভাই চম্পা' এবং 'টাক ডুমা ডুম'।

স্বর্ণকুমারী দেবী বেশ কয়েকটি নাটক লেখেন। সেগুলি হল 'দেবকৌতুক', 'পাকচক্র', 'নিবেদিতা', 'দিব্যকমল' প্রভৃতি। হেমলতাদেবীর লেখা নাটক —'শ্রী নিবাসের ভিটা', অনুরূপা দেবীর লেখা নাটকগুলি হল — 'বিদ্যারণ্য', 'কুমারিল ভট্ট', 'নাট্য চতুঃষ্টয়' — (চারটি ছোট নাটকের সংকলন গ্রন্থ।)

শৈলবালা ঘোষজায়া লেখেন — 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক।

আরও কিছু কিছু নাটক মহিলা নাট্যকাররা লিখেছেন তবে কখনোই তা সংখ্যায় খুব একটা বেশি নয়। মহিলা নাট্যকারদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ক্ষেত্র অনেকটাই আলাদা। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে নাটকের বিশেষ ক্ষেত্র বহু আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন নাটক-অন্ত প্রাণ। ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েরা বাড়িতেই স্টেজ বেঁধে নাটকের অভিনয় করত, নাটক মঞ্চস্থ করত এবং তার জন্য তাঁরা নিজেরাই নাটক লিখত। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির বাইরের মেয়েদের অবস্থান অনেকটাই অন্যরকম ছিল।

ভারতবর্ষে ইংরেজরা আসার পর যে নাট্যালয় স্থাপন হয় তাতে মহিলাদের কোনভাবেই অনুপ্রবেশের অধিকার ছিল না। রঙ্গমঞ্চে প্রকৃত নারী সংযোগের সূচনা হিসাবে বহুকাল থেকে রুশদেশীয় গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ এর (১৭৪৯-১৮১৭) উদ্যেগকেই স্মরণ করা হয়। তাঁর লেখা 'কাল্পনিক সংবদল' নামে অনূদিত নাটকে স্ত্রীলোকের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনজন অভিনেত্রী সংগ্রহ করা হয় তখনকার মেয়ে যাত্রা কিংবা ঢপকীর্তন বা ঝুমুরের দল থেকে। তাদের বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য জানা না গেলেও অনুমান করা হয়েছে কোলকাতা কিংবা পাশ্ববর্তী এলাকার পতিতাপল্লী থেকেই তাঁদের আনা হয়েছিল।

এরপর নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালায় বিদ্যাসুন্দর নাটকে নায়িকা বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণি নামে এক মহিলা অভিনয় করেন। নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালার পর এদেশে ১৮৭২ সালে প্রথম পেশাদার মঞ্চ (ন্যাশনাল থিয়েটার) প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ আটত্রিশ বছর কিন্তু প্রকৃত মহিলাদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা এই কালপর্বে বিলম্বিত হয়েছে। পরিবর্তে রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের চরিত্রে পুরুষদের রূপদানের প্রথা অব্যাহত থেকেছে। পরের বছর ১৮৭৩ এর ১৬ আগষ্ট, আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু নামে যিনি খ্যাত) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে মাইকেল মধুসুদন দত্তের লেখা 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অভিনয়ে প্রকৃত মহিলাদের সংযুক্ত করা হয়।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেননি ক্রোধে অপমানে এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন যে এরপর থেকে থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক ঈশ্বরচন্দ্র

বুঝেছিলেন রঙ্গমঞ্চে যুক্ত নাট্যার্থীদের নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাসের সঙ্গে নারীসঙ্গের এই প্রকাশ্য সংযোগ, সামাজিক নীতি ও রুচি রক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠবে — এই দৃঢ় বিশ্বাসে তিনি রঙ্গ মঞ্চে মেয়েদের অভিনয়কে সমর্থন করতে পারেননি।

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহিলাদের রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসার বিরুদ্ধে ছিলেন মূলত পানাসক্ত চারিত্রিকভাবে দুর্বল পুরুষদের রক্ষা করার জন্যে। দুর্বল পুরুষদের সামাজিক মানমর্যাদা রক্ষার জন্য ভীত বিদ্যাসাগর মহিলাদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের অধিকার থেকেই বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একজনের দুর্বলতা ও সংযমের জন্যে অন্যকে কেন তার শিল্পীসত্তা বিকশিত করতে বাধা দেওয়া? এ তো রীতিমত জুলুম।

নারীর শরীর থেকে জন্ম নেওয়া পুরুষতন্ত্র সর্বদাই নারীকে নিজের অধীনস্থ মনে করে বলেই সে তার ধ্যান ধারণা, সুখ-সুবিধা নারীর ওপর অনায়াসেই চাপিয়ে দেয়।

অবরোধের পিঞ্জরে বন্দিনী হয়েছিল উনিশ শতক বা বিশ শতকের প্রথম যুগের মেয়েরা সে। অবরোধ তো শুধু মেয়েদের শরীরেই পর্দা টানতে চায়নি, সে পর্দা টেনে রাখা হয়েছিল তাদের মনের ওপরেও। অবরোধের অনমনীয় অনুশাসন আবৃত করে ফেলেছিল অবরোধবাসিনীর ব্যক্তিত্বকেও, নিজের চিন্তা করার শক্তি, বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস— সবই তার হারিয়ে গিয়েছিল। অবরাধের নিয়ম-শাসন পঙ্গু করে দিয়েছিল মেয়েদের ব্যক্তিত্বকে। আর এরই সুযোগে শিক্ষা-দীক্ষায়, স্বাধীন পথ চলায় - কোথাও নারীকে এতটুকু মুক্তি দিতে চায়নি অনড়-অটল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-শাসন।

নারী শিক্ষা আর নারী স্বাধীনতা — এ দুয়ের ভাবনাও শুরু হয়েছে উনিশ শতক থেকেই। যদিও নারী শিক্ষার অগ্রগতি, নারী স্বাধীনতার ক্রমজাগরণ যতই গুরুত্ব পেয়েছে, ততই প্রবল হয়ে উঠেছে সমাজ মনের অনুরূপ আদর্শে নারীর এক মানসীপ্রতিমা গড়ে তোলার প্রয়াস, নারীর ক্রম-প্রসারিত চলার পথে একের পর এক লক্ষ্মণরেখার গণ্ডি টানার উদ্যোগে।

এই মেয়েদের মেয়ে করে রাখার, জড়বস্তুতে পরিণত করার কৌশলটিকে চিনে নেবার চেষ্টা হয়তো করেছিলেন আশালতা সিংহ। তারই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর লেখা নাটকেও। সমগ্র জীবনে আশালতা নাটক লিখেছেন মোটে দুটি। আশালতা সিংহের লেখা নাটক দুটি আলোচনার আগে লেখকের দেশকালের প্রেক্ষাপটটি বুঝে নেওয়া দরকার যেহেতু শিল্পীর সংবেদনশীল মনের শিল্পিত প্রকাশ ঘটে তাঁর সৃষ্টিশীল রচনায়, শিল্পীর চারপাশের সমাজ, রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর মনের দরজায় ঘা দেয়।

যেসময় আশালতা সিংহ নাটক দুটি লিখেছেন, সে সময় দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে, বিশ্বের চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গির জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যেও নবমূল্যায়ন শুরু হল। জাতিতে জাতিতে বৈরিতা, অন্ধ নির্বিচার জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে সংশয় জন্মাল। রবীন্দ্রনাথ, রোমা রোঁলা, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রভৃতি মনীষী উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সরব হলেন। সোভিয়েত রাষ্ট্র স্থাপিত হবার পর কমিউনিজম অথবা সাম্যবাদ বিশ্বের সর্বত্র প্রগতিশীল সমাজ আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের ওপর প্রভাব বিস্তার করল। বাংলায় প্রগতিবাদী চিন্তাধারার মুখপত্র 'সবুজপত্র' যৌবনের জয়টীকা হয়ে উঠল। কয়েকবছর পরে কল্লোল পত্রিকায় নবীন সাহিত্যিকেরা ফ্রয়েড ও মার্কসের তত্ত্বের আলোকে তাঁদের সাহিত্য রচনা করে চললেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মাজির নেতৃত্বে একের পর এক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং সবশেষে আইন অমান্য আন্দোলন দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলন সমগ্র জাতির চিত্ত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আলোড়িত করে তুলল। সেই সঙ্গে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনও চরমতা লাভ করল। এইরকম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পটভূমিতেই আশালতা সিংহ তাঁর নাটক দুটি লেখেন।

প্লাবনের উচ্ছাস পুরোনো জীবনকে যেমন তলিয়ে দেয় তেমনি নতুন জীবনকেও কোথাও তুলে নিয়ে আসে। নাট্যকার আশালতা যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ভাঙা-গড়ার ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের নানা প্রকার সমস্যা সঙ্কট, আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ, সমাজের চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে নবজাগ্রত আধুনিক চেতনার সংঘাত, নারী পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা — এসবই তাঁর নাটকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন নাট্যকার আশালতা সিংহ। মননের খরদীপ্তি, বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ শবজাল নিক্ষেপ নৈপুণ্য এবং আচমকা মন্তব্যের আকস্মিক ঝলসানিতে তাঁর নাটক দুটি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক জটিলতা, নর-নারীর উপভোগ্য রোমান্স, নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতা এসব বিষয় তাঁর নাটকে এসেছে।

গ্রন্থাকারে আশালতা সিংহের লেখা দুটি নাটক যথা — 'সুরের উৎস' এবং 'পুনরাবৃত্তি' প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। গ্রন্থটির নাম প্রথম নাটকের নামেই অর্থাৎ 'সুরের উৎস' রাখা হয়; যদিও 'সুরের উৎস' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৪-এর কার্তিক সংখ্যায়।

'সুরের উৎস' —

শ্রীমতী আশালতা সিংহের প্রথম নাটক 'সুরের উৎস' চারটি অঙ্ক এবং কুড়িটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। পাঁচটি করে দৃশ্য আছে প্রতিটি অঙ্কে। নাটকটির শুরুতেই লেখিকা আশালতা সিংহ পরিচয় বলে একটি

পর্ব রেখেছেন।

'সুরের উৎস' নাটকটির পাত্রপাত্রীর যে পরিচয় নাট্যকার আশালতা সিংহ দিয়েছেন তা এরকম —

জ্ঞানদাবাবু — অধ্যাপক,

মোহিনী — জ্ঞানদাবাবুর স্ত্রী

নির্মল — 'তাঁহাদের প্রতিবেশী যুবক'

ইন্দিরা — জ্ঞানদাবাবুর কন্যা

নরেন — জ্ঞানদাবাবুর পুত্র।

মিঃ নন্দী — বিলাত ফেরৎ তরুণ অধ্যাপক।

শান্তা — ইন্দিরার শিক্ষায়িত্রী।

মনোজবাবু — ইন্দিরার মেসোমশায়।

ফুল্লরা — মনোজবাবুর কন্যা।

মিঃ ভাদুড়ী — বিলেত ফেরত বালিগঞ্জ নিবাসী আধুনিক ভদ্রলোক।

রেবা — মিঃ ভাদুড়ীর কন্যা।

উক্ত চরিত্র ছাড়াও লেখিকা জানাচ্ছেন কিছু অপ্রধান চরিত্র যেমন ভৃত্য ব্রজ, টেনিস খেলার কোর্টে জ্ঞানদাবাবুর কয়েকজন বন্ধু, ইন্দিরার জন্মতিথি উৎসবে তার কলেজের কয়েকজন বান্ধবী ইত্যাদি আরও কয়েকটি ছোট-খাট চরিত্র আভাসে মাত্র দেখা যাবে।

মোট চারটি অঙ্ক এবং কুড়িটি দৃশ্য রয়েছে 'সুরের উৎস' নাটকে।

নাটকটি শুরুই হচ্ছে জ্ঞানদাবাবুর বাড়ীর বসবার ঘরের দৃশ্য দিয়ে। প্রফেসর জ্ঞানদাবাবু সেখানে কলেজের ছাত্রদের খাতা দেখছেন। আধুনিক বিলাতী কায়দায় সজ্জিত বসবার ঘরে জ্ঞানদাবাবুর স্ত্রী মোহিনী দেবীও স্বামীর কাছাকাছি বসে বালিশের ওয়াড়ে ফুল তুলেছেন। দৃশ্যটি দেখে আমাদের বেগম

রোকেয়ার লেখা 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে যায়। শ্রীমতী রোকেয়া লিখেছিলেন — শিক্ষিত ''স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন।''[১]

একই-ভাবে আশালতাও শিক্ষিত স্বামী এবং অর্ধশিক্ষিত স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বিপুল ব্যবধানের ফলেই নারী যে সমাজ ও পরিবারে নিজের যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে অক্ষম তাঁর একটি করুণ চিত্র নাটকে তুলে ধরেছেন। আমাদের মনে হওয়া আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখব জ্ঞানদাবাবু ওর স্ত্রীকে দেশের দশের খবর জানাতে খবরের কাগজে দাগ দিয়ে দিয়েছিলেন পড়বার জন্য কিন্তু স্ত্রীর খবরের কাগজ পড়বার অবসর হয় না বলা ভাল ইচ্ছে টাও তেমন জোড়ালো হয় না বরং সংসারে সকলের সমান্য সুখ সুবিধারও যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য তিনি তৎপর।

মেয়ে ইন্দিরা বেথুন কলেজের ছাত্রী। কলেজে পড়ানো ছাড়াও জ্ঞানদাবাবু মেয়েকে গৃহশিক্ষক রেখেও পড়ান। শান্তা মিত্র ইন্দিরার শিক্ষায়িত্রী। ইতিহাসে এম.এ, ফাস্টক্লাস! বছরত্রিশের অবিবাহিত শান্ত দেবী চেহারা সুশ্রী, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য তাঁকে ব্যক্তিত্বময়ী করে তুলেছে। ইন্দিরাকে তিনি শুধু ক্লাসের পড়াতেই সাহায্য করেন না অনেক বাইরের বইও তিনি তার ছাত্রীকে জোগান দেন, যেমন তিনি গিবসেনের বই এনে ইন্দিরাকে পড়তে দেন।

মেয়ে ইন্দিরা পিতা মাতা উভয়কেই ভালো বোঝেন। পিতা জ্ঞানবাবুর জ্ঞানগর্ভ মানসিকতার যেমন সে অংশীদার তেমনি গৃহকর্মনিপুণা মায়ের সব দিকে যে নজর সে বিষয়েও ইন্দিরা ভালোমতই ওয়াকিবহাল।

ইন্দিরার মেসোমশায় মনোজবাবুর মুখে আমরা জানতে পারি ইন্দিরার মাসি কিন্তু মোটেই তার মায়ের মত নয়, তিনি কিন্তু সংসার অন্ত প্রাণ নয়। ইন্দিরার মাসি বিভিন্ন মিটিং এ যান, মিটিং-এ সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি মেয়েদের সার্বিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। ইন্দিরার মাসতুতো বোন ফুল্লরাদেবী যথেষ্ট প্রগতিশীল তরুণী। ফুল্লরা তার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ করতে বাবা মনোজবাবুর সঙ্গে ইন্দিরাদের বাড়ি এসেছেন। মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিষয়ে ফুল্লরার মত খুব স্পষ্ট; তাই তো ইন্দিরা যখন জন্মদিনের নিমন্ত্রণ পেয়ে তার মায়ের কাছে অনুমতি চাইলে, ফুল্লরা বলে — 'মা আবার কি বলবেন? তোর ইচ্ছে হয় যাবি, না ইচ্ছা হয় যাবি নে। এ ও ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচির কথা।'[২] ফুল্লরা শুধু আধুনিক প্রগতিশীলই নন রীতিমত ফ্যাশন দুরস্ত মেয়ে।

তবে এমন প্রগতিশীল মেয়ে এবং স্ত্রী পেয়ে মনোজবাবু যে খুব সুখী তাঁর কথায় অন্তত তা মেনে হয় না। কারণ মনোজবাবুর কথায় — ''.... বামুনে কিংবা বাবুর্চ্চিতে যা তৈরী করে এনে দেয় খাই। কোন বিকার নেই, ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হলেই হ'ল। কেবল অনেক রাত্রিতে কাজকর্ম সেরে খেটেখুটে যখন বিছানায়

এসে দেখি চাকর বেটা এমন করে মশারি খাটিয়েছে যে সারারাত্রি মশার কামড় খাওয়া ছাড়া উপায় নেই, তখন রীতিমত কষ্ট হয়। কিন্তু গৃহিণীকে একথা বলতে কেমন যেন লজ্জা করে।''[৩]

মেয়েরা যে শুধু পুরুষ মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য নিজের জীবনপাত করবে — এই ধরনের চাওয়াটি বহুযুগ ধরে চলে এলেও মনোজবাবুর মত চরিত্রেরা সেটা স্পষ্ট করে চাইতে কিংবা দাবি করতে লজ্জা অনুভব করছে। লেখিকার এধরণের চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে তার মনোভাবটি আমাদের কাছে খানিকটা হলেও স্পষ্ট হয়।

এরই সঙ্গে জ্ঞানদাবাবুর কথাও আমাদের মনে দাগ কাটে। ''(উত্তরোত্তর মুগ্ধ হইয়া) দেখলি ইন্দু, দেখ! আর তোর মা? .... তার কাছে মশারির একটা কোণ সোজা ক'রে টাঙান দেশের সব বড় বড় সমস্যার চেয়ে মূল্যবান! এ যে ভগবানের দেওয়া এত বড় জীবনটার দস্তুর মত অপব্যয়!''[৪]

মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত যে ঘরের পূরুষটির সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করা নয়, একথা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন লেখিকা। তবে কৌশলে সেই কথাটি একটি পুরুষ চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন তিনি। কারণ কোন মেয়ের মুখে কথাটি বসালে সমাজপতিরা হয়তো রে রে করে ছুটে আসতো। জ্ঞানদাবাবুর বড় ছেলে রমেন বিদেশে পড়তে গেছে। এই রমেন অনেকদিন তার বাবা মাকে ঠিকমত চিঠিপত্র দিচ্ছে না। ফলে পিতা-মাতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বেনামীতে পুত্র রমেনের নামে যেসব চিঠি আসত যার অধিকাংশ বাড়ির লোকেরা মিথ্যা বলে মনে করত, দেখা গেল আস্তে আস্তে সে সবই সত্য। একদিন রমেনই তার পিতাকে সরাসরি চিঠি লিখে জানায় যে, সে এক বিদেশিনীকে বিয়ে করেছে। অনুমতি এবং আশীর্বাদ কোনটাই নেবার সময় তার হয়নি।

যাই হোক, প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতেই দেখি ইন্দিরা গান গাইছে — ''বধুঁয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে ...''[৫] অতুল প্রসাদী এই গানের আবহাওয়ায় চারিদিক যখন সমাচ্ছন্ন এমন সময় নির্ম্মল নামক যে যুবকটি ইন্দিরাদের পাশের বাড়িতেই থাকে এবং ইন্দিরার পাণিপ্রার্থী তার আবির্ভাব নাটকীয় পরিবেশকে আরও আবেগঘন করে তুলেছে। নির্ম্মল এবং ইন্দিরার এ ধরনের সম্পর্ক তাদের পরিবারেরও সমর্থন পেয়েছে। মেয়ে ইন্দিরাকে কলেজে পড়ানো, শিক্ষয়িত্রী রেখে বাড়িতে বিশেষ যত্ন করে তাকে গান বা লেখাপড়া শেখানো, বিবাহের পূর্বে - প্রেমাস্পদের সঙ্গে কথা, আলাপ-আলোচনা, বাড়িতে অবাধ যাতায়াত — তৎকালীন সমাজ পরিবেশে এ ধরনের একটি পরিবারকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করে লেখিকা আশালতা সিংহ যার-পর-নাই প্রগতিশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় নির্মল-ইন্দিরার মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির আবহাওয়া তৈরি হয়েছে মি. নন্দীকে ঘিরে। মি. নন্দী ইন্দিরাদের পূর্বপরিচিত এবং ইন্দিরাদের বাড়িতে ইনি টেনিস খেলতে আসতেন। নির্ম্মল-ইন্দিরার মধ্যে যে মান-অভিমান-ঈর্ষা মি. নন্দীকে কেন্দ্র করে

ঘটে তা যে নির্ম্মল-ইন্দিরার প্রেমের অধিকারকেই বেশি করে উস্‌কে দেয়। সেটাই কৌশলে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন।

চতুর্থ দৃশ্যেও নির্ম্মল-ইন্দিরার প্রেম পর্বকেই বিশদ আকারে দেখানো হয়েছে, সেই সঙ্গে নায়ক-নায়িকার হৃদয়াবেগ ও মন-মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থ দৃশ্যের শেষ ইন্দিরার গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যায়। 'সুরের উৎস' নাটকের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য সুরের মূর্চ্ছনাতেই শেষ হয়। প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যায় জ্ঞানদাবাবুর বাড়ির চায়ের টেবিলে সকাল বেলাকার চা-পানের পর্ব চলছে, সেই সঙ্গে ইন্দিরা তার জন্মতিথি উপলক্ষে সকলকে কেক কেটে কেটে দিচ্ছেন। বাড়ির লোকেরা ছাড়াও নির্মল এবং ইন্দিরার গৃহ শিক্ষিকা শান্তা দেবী আছেন; মিস্টার নন্দীও এসে উপস্থিত হন। সন্ধ্যাবেলায় ইন্দিরার জন্মতিথি উপলক্ষে একটা ছোট অনুষ্ঠান হবে। সেখানে মি. নন্দীকেও জ্ঞানদাবাবু নিমন্ত্রণ করেন। এছাড়া নির্ম্মল, শান্তা দেবী, ফুল্লরা ছাড়াও আরও দু চারজন আত্মীয় বন্ধুরাও সে অনুষ্ঠানে আসবে। সকালে চায়ের টেবিলেই জ্ঞানদাবাবু মিস্টার নন্দীর প্রশংসা করেন তার গত দিনে ক্লাবে মেয়েদের শিক্ষা এবং জাগরণের ওপর বক্তৃতার জন্য। একথা থেকেই আমরা তৎকালীন সমাজ পরিবেশে যে নারী শিক্ষা, নারী জাগরণের ঢেউ এসেছিল, সেকথা জানতে পারি।

জ্ঞানদাবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমরা এ-ও জানতে পারি যে, জ্যেষ্ঠপুত্র রমেনের আচরণে পিতা হিসাবে জ্ঞানদাবাবু খুবই আঘাত পান। আগে থাকতেই তাঁর হাইব্লাড প্রেসার ছিল এখন তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। জ্ঞানদাবাবু মোটা টাকা মাইনে পেলেও ঠাঁট-বাট নিয়ে চলতে গিয়ে মাত্রা ছাড়া ব্যয়ও করতেন। তিনি রমেনকে বিলেতে পড়াতে গিয়ে অনেক টাকা ব্যয়ও হয়; কিছু দেনাও হয়ে যায়। আশা করেছিলেন রমেন পাশ করে দেশে ফিরে ভালো চাকরি পেলে সমস্ত আর্থিক সংকট দূর হবে। এমন সময় রমেনের বিদেশিনীকে বিয়ে করা, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা — এসব আচরণ জ্ঞানদাবুকে একেবারে শরীরে-মনে বিপর্যস্ত করে ফেলে। বিশেষত অন্য দুই সন্তান নরেন-ইন্দিরা এবং স্ত্রী মোহিনী দেবীর কথা ভেবে জ্ঞানদাবাবু খুবই উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখি জ্ঞানদাবাবুর বাড়ির বড় হলঘরে ইন্দিরার জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ইন্দিরাদের জানা-শোনা বেশ কয়েকজন অতিথিও উপস্থিত হয়েছে। তবে ইন্দিরার মা এবং বাবা ভেতরের ঘরেই রয়েছেন। জ্ঞানদাবাবুর শরীর তো পূর্বেই অসুস্থ ছিল। মোহিনীদেবীও সেদিন বিছানা থেকে উঠতে পারেননি। ইন্দিরার গান সকলেই শুনতে চায় কিন্তু ইন্দিরা ঐ দিন গান গাইতে পারে না। ইন্দিরার মাসতুতো বোন ফুল্লরাদেবী সকলের অনুরোধে এরপর একটি গজল পরিবেশন করেন। ফুল্লরার গান সকলকে মুগ্ধ করে বিশেষত মিস্টার নন্দীকে। মিস্টার নন্দী এর আগেও ইন্দিরাদের

বাড়িতে টেনিস খেলার অজুহাতে এসেছেন। ইতিমধ্যে মিস্টার নন্দী ইন্দিরার প্রতি একটু বেশিই আগ্রহী হয়ে পড়েন কেননা ইন্দিরা সুন্দরী, তন্বী, গায়িকা, মার্জিত রুচি অল্পবয়সী অবিবাহিতা যুবতী। যদিও এই আগ্রহ বিঘ্নিত হয় যখন শোনেন ইন্দিরা নির্ম্মলের এক রকম বাগদত্তা এবং নির্ম্মলের বিদ্যার বল এবং অর্থ বল অত্যন্ত বেশি পরিমাণে রয়েছে। এসময় মিস্টার নন্দীর আগ্রহ তাই ইন্দিরা থেকে ঘুরে ফুল্লরার দিকে খানিকটা বেশি দেখা যায়।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখি জ্ঞানদাবাবুর বাগানের মধ্যে একটি বেঞ্চে নির্ম্মল চুপ করে বসে আছে। ভেতরে জন্মদিনের উৎসব চলছে কিন্তু ইন্দিরাও হল ঘরে না থেকে নির্ম্মলের কাছে এসে বসে; নির্ম্মল যদিও ইন্দিরাকে বলে ভেতরে অনুষ্ঠান চলছে, লোকজন-আমন্ত্রিতদের এভাবে ছেড়ে চলে আসা ঠিক নয়, কিন্তু ইন্দিরা নির্ম্মলকে বুঝিয়ে দেয় যে তাকে ছাড়া অনুষ্ঠানে সবার সঙ্গে শুধুমাত্র সামাজিকতা রক্ষা করে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর নির্ম্মল যখন ইন্দিরাকে নিয়ে অনুষ্ঠানে যেতে উদ্যত হয় সেই সময়ে বাড়ির পুরোনো চাকর ব্রজ এসে জানায় যে জ্ঞানদাবাবুর শারীরিক অবস্থা বেশ খারাপ। নির্ম্মল ইন্দিরা ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত হয়ে জ্ঞানদাবাবুর ঘরের দিকে যায়। এখানেই দ্বিতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দেখি জ্ঞানদাবাবুর ঘরের শয়নকক্ষের খাটে তিনি শুয়ে আছেন, মাথায় জলপট্টী দিয়ে স্ত্রী মোহিনী দেবী পাখা করছেন। ইন্দিরাকে নিয়ে নির্মল পাশের ঘরে যান কারণ এই আশঙ্কায় যে পাছে জ্ঞানদাবাবুর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। পাশের ঘরে গিয়ে নির্ম্মল একটা হলদে ভেলভেটের খামে রমেনের কাছ থেকে আসা চিঠির মর্মার্থ ইন্দিরাকে বলে। রমেন যে বিদেশিনী ডোরা স্মিথকে বিয়ে করেছেন সেকথাও নির্ম্মল বলেন। সেইসঙ্গে নির্ম্মল খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গেই জানান আধুনিক প্রগতিশীল জীবনে পিতা-মাতাকে অগ্রাহ্য করে প্রেম করে বিবাহ একটি নীতিহীন কাজ। এরপর নির্ম্মল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেন জ্ঞানদাবাবুর কুশল জানতে। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেখি জ্ঞানদাবাবু গুরুতর অসুস্থ, ডাক্তার এসে দেখছেন। ডাক্তার নির্ম্মলকে আলাদা করে ডেকে বলেন যে বাঁচার আশা খুবই ক্ষীণ।

দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যেও দেখা যায় সকলেই জ্ঞানদাবাবুর শুশ্রুসায় নিয়োজিত। মিস্টার নন্দী এবং ফুল্লরা মার্কেটের দিকে যাচ্ছিলেন। পথের মাঝে ইন্দিরাদের বাড়ি পড়ায় সেখানে তারা সৌজন্য রক্ষার্থে জ্ঞানদাবাবুর খোঁজ নিয়ে যান। বলাই বাহুল্য এই যাওয়ার মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিলনা। এই দৃশ্যেই জ্ঞানদাবাবুর মৃত্যু হয় এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

এখানেই নাটকের ক্লাইমেক্স শুরু হয়। জ্ঞানদাবাবুর মৃত্যুর পর পরিবারের কি হবে — এটাই সকলের মনে প্রশ্ন। এরপর কি নির্ম্মল জ্ঞানদাবাবুর সংসারের সমস্ত ভার তুলে নেবে? মোহনীদেবীই বা কাকে অবলম্বন করবেন? আদৌ তাঁর অবলম্বনের প্রয়োজন আছে কি না; থাকলেও তিনি নেবেন

কিনা?

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় পিতার মৃত্যুতে ইন্দিরা-নরেন তাদের মা-কে নিয়ে অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন। মায়ের পরামর্শেই তারা বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়ি বিক্রি করে সেই টাকার কিছু অংশ দিয়ে জ্ঞানদাবাবুর ধার নেওয়া টাকা শোধ করে, কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রেখে তারা আপাতত একটি ছোট ভাড়া বাড়িতে উঠে যায়। মোহিনী দেবী আরও বলেন ছোট ছেলে নরেনকে এবার পড়ায় ইতি টেনে কাজের সন্ধান করতে হবে। নির্ম্মল সাহায্যের হাত বড়িয়ে দিলেও মোহিনী দেবী তা নিতে রাজি হন না। ইন্দিরা সংসারের বোঝা শুধুমাত্র ছোড়দা নরেনের উপর দিতে নারাজ। ইন্দিরা নিজে কিছু উপার্জন করে সংসারের দায়িত্ব তার দাদার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। ইন্দিরার চাকুরি করার ইচ্ছার কথা শুনে নির্ম্মল রীতিমত বিস্মিত এবং আহত হয়। সংসারে সবার না হোক অন্তত ইন্দিরার ভারটা নিয়েও সে অন্যদের খানিকটা স্বস্তি দিতে চায়। কিন্তু ইন্দিরা তা চায় না এবং এ ব্যাপারে সে নির্ম্মলকে তার পাশে পেতে চায়। এখানেই এই দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখি ইন্দিরার ছোড়দা নরেনও একটি পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরি জোগাড় করেছে। এই দৃশ্যে কীভাবে নরেন তার চাকুরিটা জোগাড় করল তারই বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় একটি একতলা সাধারণ ছোট বাড়িতে ইন্দিরা বাসন মেজে তুলে রাখছে। এমন সময় মিস্টার নন্দী এসে বিয়ের কার্ড দেয় ইন্দিরাকে। ফুল্লরাদেবীর সঙ্গে মিস্টার নন্দীর বিবাহ। ইন্দিরাকে এমন অবস্থায় দেখে মিস্টার নন্দী খুবই অবাক হন। মিস্টার নন্দী বিয়ের পর সস্ত্রীক বিলেত যাবেন, তাই তিনি ইন্দিরার কাছে তার দাদা রমেনের ঠিকানাটা চান। বলেন যে বিলেতে গিয়ে তিনি রমেনের সঙ্গে দেখা করে তাদের পরিবারের কথা জানাবেন। এতে অবশ্য ইন্দিরা মিস্টার নন্দীকে অযাচিতভাবে করুণা করতে বারণ করে। অগত্যা মিস্টার নন্দী বিদায় গ্রহণ করেন।

চতুর্থ দৃশ্যে দেখি ইন্দিরা তার মাকে বলছে সংসারের জন্য সে চাকরি করতে চায়, মা-এতে কিছুতেই রাজি হন না। ইতিমধ্যে নির্ম্মল এসেছেন, সে এলাহাবাদে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে চলে যাবে বলে ঠিক করেছে। ইন্দিরা নির্ম্মলকে বলে যে তাঁর অনেক টাকা তাই দূরে গিয়ে চাকরি করাটা তার নেহাতই সখ কিন্তু ইন্দিরার কাছে চাকরি করাটা এখন সংসারে খানিকটা আর্থিক সুরাহার জন্য। নির্ম্মলও এতে আহত হন এই ভেবে যে, তাঁর টাকা ইন্দিরাদের অসময়ে কোন কাজেই আসছে না। তবে নির্ম্মল ইন্দিরাকে এও বলেন যে, কোন সময় যদি রমেন ফিরে আসে তখন সে যেন নির্ম্মলকে আর অপেক্ষা না করায়।

এরপর পঞ্চম দৃশ্যে। ইন্দিরা একটি শিক্ষয়িত্রীর চাকুরী জোগাড় করে বালিগঞ্জের ধনী গৃহ মিস্টার ভাদুড়ীর বাড়িতে। ঐ বাড়ির মেয়ে রেবাকে লেখাপড়া এবং গান শেখাতে হবে। মিস্টার ভাদুড়ী ইন্দিরার

প্রতি অযাচিত করুণা দেখালে ইন্দিরা তা নিতে অস্বীকার করে। ইন্দিরা পরিস্কার করে বলে যে — 'আমি ত আপনাদের নিমন্ত্রিত অতিথি নই। পয়সার জন্য কাজ খুঁজতে এসেছি। আমার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করলেই সুখী হব।'[৬] (পৃ. ৭০) মিস্টার ভাদুড়ির অল্পবয়সী মেয়েদের প্রতি যে দুর্বলতা রয়েছে সেকথা মিসেস ভাদুড়ি জানতেন। আর তাই তিনি তার মেয়ের জন্য অল্পবয়সী কোন শিক্ষয়িত্রী রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। সংসারে মিস্টার ভাদুড়ীর মত শিথিল চরিত্রের পুরুষও যে আছে এবং তাদের স্ত্রীকে কীভাবে যে এ জ্বালা সহ্য করতে হয় সেদিকেও লেখিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটাও সত্যি যে অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং সন্তানের জন্যই মিসেস ভাদুড়িকে সমস্ত মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখি নির্ম্মল এলাহাবাদ যাচ্ছেন চাকরি নিয়ে। স্টেশনে নরেন-ইন্দিরা এসেছে। ইন্দিরার সঙ্গে তার শিক্ষক শান্তা মিত্রের অনেকদিন পর দেখা হয়। ইন্দিরা সংসারে আর্থিক সাহায্যের জন্য গৃহ শিক্ষকতার কাজ নিয়েছে জানতে পেরে শান্তাদেবী বলেন — '... কিন্তু মেয়েদের ঐ স্বাধীন জীবিকার পথে আমিও চিরকাল চলে এলুম। আমাদের দেশে ও-পথে সম্মান নেই, মাধুর্য্য নেই। বড়ই রুক্ষ, নিরানন্দ।'[৭] শান্তা মিত্রের এ হেন মন্তব্য মেয়েদের জীবনের সার্থকতা কিসে তা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। এ কি লেখকের মনোভাব না কি পুরুষ অনুসারী সমাজ যা চায় তা শান্তা মিত্রের মুখ দিয়ে জোর করে বলানো। কারণ মেয়েদের চাকুরি করার পথটা রুক্ষ, নিরানন্দময় আর স্বামী সন্তান নিয়ে সংসারের নানান কাজে ব্যস্ত মহিলাদের জীবন একেবারে মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয় — এমন উপলব্ধি কি করে হল শান্তাদেবীর? পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে।

এই নাটকে শিক্ষক শান্তা এবং ছাত্রী ইন্দিরার মত গুরু শিক্ষার্থী যেমন রয়েছে তেমনি রেবার মত ছাত্রীও আছে যে ইন্দিরাকে অসম্মান করে। অভিজাত পরিবারের মিসেস ভাদুড়ি যেমন প্রথম থেকেই ইন্দিরার উপর ক্ষুব্ধ মিস্টার ভাদুড়িও তেমনি ইন্দিরাকে ফাঁদে ফেলতে সদা সচেষ্ট।

এই দৃশ্যেই শান্তাদেবী নির্ম্মলের দেওয়া চিঠি ইন্দিরাকে দেয়। নির্ম্মল এবং ইন্দিরার মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের পুনঃনির্মাণে শান্তাদেবীর একটি ভূমিকা রইল।

এই অঙ্কেরই তৃতীয় দৃশ্যে দেখি ইন্দিরা মিস্টার ভাদুড়ীর অসৎ অভিপ্রায় বুঝতে পারে। তাই সে নানাভাবে মিস্টার ভাদুড়ীর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করে। মিস্টার ভাদুড়ীর অযাচিত করুণা নিতে অস্বীকার করে এবং পড়িয়ে ফিরতে একটু রাত হলে সে তার ছোটদাদাকে বলে তাকে যেন সে গিয়ে নিয়ে আসে। তবুও এরই মধ্যে একদিন ছাত্রী রেবার অনুরোধে ইন্দিরাকে একই গাড়িতে মিস্টার ভাদুড়ীর সঙ্গে যেতে হয়। মিস্টার ভাদুড়ি যেন এই দিনেরই অপেক্ষায় ছিলেন।

এই অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায় মিস্টার ভাদুড়ির সঙ্গে ইন্দিরা মোটরে যাচ্ছেন। এরপরেই শুরু হয় স্তবগান। এ হেন আচরণে ইন্দিরা আরও সতর্ক হয়। আরও কাছে এসে ইন্দিরার হাত নিয়ে মিস্টার

ভাদুড়ি যখন হাত দেখার ভান করে এবং তার মুখ দিয়ে অবলীলায় বেরিয়ে পড়ে গুটি কয়েক কথা — 'আঃ কি নরম হাত'[৮] ইন্দিরা উপস্থিত বুদ্ধি খরচ করে গাড়ি থামিয়ে নেমে একেবারে সোজা হাঁটা পথে বাড়ি পৌঁছায়। সে যাত্রায় প্রায় ঘটতে যাওয়া একটা অসভ্যতা থেকে সে রেহাই পায়।

এরপরেই পঞ্চম দৃশ্য। এটাই এই নাটকের শেষ দৃশ্য। এই শেষ দৃশ্যে দেখি ইন্দিরা বাড়িতে একা বসে আছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্ম্মল আসেন; নির্ম্মলের হাতে রমেনের চিঠি ইন্দিরার কাছে পুরো ব্যাপারটাই ভীষণ অপ্রত্যাশিত। নির্ম্মলের কথায় বোঝা যায় — সে এক রকম চাকুরি ছেড়েই এসেছন আর ইন্দিরাও ঐরকম পরিবেশে পড়াতে যাবে না। এদিকে রমেনও দেশে ফিরছে বড় চাকরি নিয়েই। সংসারের হালও হয়তো সেই ধরবে এখন থেকে। তার চিঠিতে সেরকমই ইঙ্গিত রয়েছে। রমেনের সঙ্গে মিস্টার নন্দী এবং তার স্ত্রী ফুল্লরা দেবীও এসেছেন। সম্ভবত এদের মুখেই রমেন তার পরিবারের সমস্ত সংবাদ জেনেছে।

এবার আর ইন্দিরার নির্ম্মলকে বিয়ে করতে আপত্তি থাকবে না। আর যেন সে নির্ম্মলকে অপেক্ষা না করায় — এই অনুরোধই করেন ইন্দিরাকে নির্ম্মল।

নাটকের শেষের দিকে নাট্যকার আশালতা সিংহ যেন খুব তাড়াতাড়ি সুন্দর সমাধান করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারবে অর্থাৎ ইন্দিরার মতো প্রগতিশীল মেয়েকে নির্ম্মলের যোগ্য সহধর্মিনী রূপে দেখানোতেই নাটকের সার্থক সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এভাবে শেষ করার মধ্যেও একটা চাপা বিদ্রোহ আছে। ইন্দিরা যেখানে পড়ানোর কাজ নিয়েছিল সেই মিস্টার ভাদুড়ি যদি সজ্জন ব্যক্তি হতেন কিংবা ছাত্রী রেবা যদি অনুগত ছাত্রী হত তাহলেও কি ইন্দিরার ওরকম তিক্ত অভিজ্ঞতা হত? আর তিক্ত অভিজ্ঞতা না হলেও নিজের স্বাধীন উপার্জনকে মেয়েরা এত ছোট করেই বা দেখবে কেন? প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

নাট্য দ্বন্দ্ব —

প্রত্যেক নাটকই আশ্রয় করে একটি দ্বন্দ্বকে। সে দ্বন্দ্ব শারীরিক, মানসিক, ভাবগ, আদর্শগত, সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত যাই হোক না কেন। নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা সেই দ্বন্দ্বের পরিচয়টি পেতে চাই। অন্তত তার সুস্পষ্ট আভাস এবং সেই সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচিত হতে চাই দ্বন্দ্বের দুই পক্ষের প্রধান চরিত্রগুলোর সঙ্গে।

আশালতা সিংহের লেখা 'সুরের উৎস' নাটকে প্রথম অঙ্কেই আমরা জ্ঞানদাবাবুর পরিবারকে দেখি। সেইসঙ্গে এও জানতে পারি তাঁর বড় ছেলে রমেন বিদেশে পড়তে গেছে। রমেনের সম্পর্কে

অনেক কিছুই বেনামী চিঠিতে জ্ঞানদাবাবুর হাতে এসে পৌঁছেছে যা পড়ে জ্ঞানদাবাবুর শারীরিক অবনতি ঘটেছে। বড় ছেলে রমেনকে বিলেতে পড়াতে এবং ঠাঁটে-বাটে চলতে জ্ঞানদাবাবু ভবিষ্যতের জন্য কিছুই প্রায় সঞ্চয় করতে পারেননি। আশা ছিল — বড় ছেলে ফিরে এসে ভালো চাকরী করে সংসারের হাল ধরবে। কিন্তু তা যে হচ্ছে না সেটার আভাস প্রথম অঙ্কেই নাট্যকার দিয়েছেন। তাতেই জ্ঞানদাবাবুর সংসারের সঙ্কটের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম অঙ্কেই নাট্যদ্বন্দ্বের পরিচয় দর্শক পাবে।

দ্বন্দ্বই যে নাটকের প্রাণ একথা সর্বজনবিদিত। যদিও ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বার্ণাড শ অবশ্য দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন নাটক মানেই 'Discussion discussion and discussion only', যদিও পরবর্তীকালে ভাবপ্রধান ও সমস্যামূলক নাটকে এই মতবাদ টেকেনি। অন্যদিকে প্রাচীন গ্রীক নাটক থেকে শুরু করে শেকসপীরীয় নাটক এবং আধুনিক নাট্যসৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে দ্বন্দ্বহীন জীবন নাটকের বিষয়বস্তু হতেই পারে না। যদিও তার প্রকৃতি প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত অনেক পাল্টে গেছে। দ্বন্দ্বের তীব্রতা সম্বন্ধে লেখক ও পাঠকের ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

দ্বন্দ্ব বিভিন্ন ধরনের হয়। রাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা পরিবারের সংগ্রাম। দুটি একক মানুষের দ্বন্দ্ব, আদর্শগত দ্বন্দ্ব আবার ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ব্যক্তির লড়াইটা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নয়, লড়াইটা তার নিজের মধ্যেই। আশালতা সিংহের 'সুরের উৎস' নাটকে নায়িকা ইন্দিরার লড়াইটাও তাঁর ব্যক্তিগত। স্বাধীন জীবিকার পথে মেয়েদের চলা উচিত হবে কিনা, - এ নিয়ে ইন্দিরা অনেক ভেবেছে। সংসারের আর্থিক দুর্দশা মোচনে সে প্রেমিক নির্ম্মল এবং মা মোহিনী দেবীর মতের বিরুদ্ধে গিয়ে গৃহশিক্ষয়িত্রীর চাকরী নিয়েছে। ইন্দিরার শিক্ষাগুরু শান্ত দেবীও এ পথে অগ্রসর হতে ইন্দিরাকে বারণ করেছেন।

মিস্টার ভাদুড়ির মেয়ে রেবাকে পড়াতে গিয়েও ইন্দিরার অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো হয়নি। আবার ভাবী স্বামী-প্রেমিক নির্ম্মলও ইন্দিরার এ ধরনের সিদ্ধান্তের জন্য তার থেকে দূরে এলাহাবাদে চাকরী নিয়ে চলে যায়। ইন্দিরা বোঝে সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটা তবুও সে সংসারের জন্য চাকরী নেয়। যদিও শেষ পর্যন্ত মিস্টার ভাদুড়ির হাত থেকে রেহাই পেতে তাকে চাকরী ছাড়তেই হয়। মিস্টার ভাদুড়ির ওখানে চাকরী ছাড়ার পর সে অন্য চাকরীও খুঁজতে পারত। সব খানেই যে ইন্দিরাকে হেনস্থা হতে হবে এমন তো নাও হতে পারে তবু ইন্দিরা চাকরী খোঁজে না। পরিস্থিতিও অন্যরকম হয়, কারণ শোনা যায় ইন্দিরার দাদা রমেনও বিলেত থেকে ফিরছে, দেশে এসে বড় চাকরী নিয়ে বাড়ির দায়-দায়িত্ব সেই বহন করবে এখন থেকে।

খুব তাড়াতাড়ি একরকম জোর করেই যেন ইন্দিরার এই দ্বন্দ্বকে দূর করেছেন নাট্যকার আশালতা।

ফলে শেষের দিকে চরিত্রের বিকাশও বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে বলেই মনে হয়।

খুব কম পরিমাণে হলেও মনোজবাবু নাটকে যিনি ইন্দিরার মেসোমশাই তার মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। মেয়েদের আধুনিক প্রগতিশীল রূপকে তিনি অপছন্দ করেন না। কিন্তু আধুনিক স্ত্রী যখন মিটিং করেন, সভা অলংকৃত করে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফেরেন। সেটাও মন থেকে মানতে পারেন না।

চরিত্র —

নাটকীয় চরিত্র নিয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন অ্যারিস্টটল। তিনি অবশ্য আলোচনা করেছেন মূলত ট্রাজেডি সম্বন্ধেই। তাঁর মতে নাটকীয় চরিত্র মানেই কিছু নৈতিক গুণ ও অপগুণের সমষ্টি। তা অবশ্য প্রকাশ পায় চরিত্রের আচরণ ও সংলাপ থেকে। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণ সম্বন্ধে আর একটি যে উল্লখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন হার্ডসন, সে বৈশিষ্ট্যটি হল নাটকের বস্তুধর্মিতা বা নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিকতা। যে নৈর্ব্যক্তিকতা কাহিনী গ্রন্থনে নাট্যকারকে বজায় রাখতে হয় চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তা তাঁকে গভীরভাবে স্মরণ করতে হবে। এখানেই উপন্যাসের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্র চিত্রণের পার্থক্য। মানুষের জীবনের প্রেম ও প্রেমহীনতা, প্রবৃত্তি ও জিতেন্দ্রিয়তা, তার সমস্ত রকম চিত্তবৃত্তির ব্যাখ্যা উপন্যাসে থাকতে পারে, উপন্যাসে তা আশা করতে পারেন নিষ্ঠ সমালোচক, কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে তা ব্যাখ্যা করার কোন রাস্তা খোলা নেই। তিনি চরিত্রগুলিকে শুধু উপস্থিত করতে পারেন। কিছু আচরণ ও সংলাপের মাধ্যমে তার মানসিকতার কিছু বিশেষ দিক পরিস্ফুট করার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু জীবন ব্যাখ্যার সচেতন উৎসাহ তাঁকে সম্বরণ করতেই হয়, পাঠক বা দর্শক যদি তা বুঝে নিতে পারেন সেখানেই তার কৃতিত্ব।

আশালতা সিংহের লেখা ‘সুরের উৎস’ নাটকে মোট ছয়টি পুরুষ এবং ছয়টি নারী চরিত্র আছে। এরা ছাড়া নাট্যকার দেখিয়েছেন কিছু অপ্রধান চরিত্র যেমন ভৃত্য ব্রজ, জ্ঞানদাবাবুর কয়েকজন বন্ধু, ইন্দিরার জন্মতিথি উৎসবে উপস্থিত তাঁর কলেজের কয়েকজন বান্ধবী। আরও কয়েকটি ছোট খাটো চরিত্র আভাসে মাত্র দেখা যায়।

প্রধান নারী চরিত্রেরা হলো — ইন্দিরা, ইন্দিরার মা মোহিনী দেবী, শান্তা দেবী, ফুল্লরা দেবী, মিসেস ভাদুড়ি, ভাদুড়ি কন্যা রেবা। প্রধান পুরুষ চরিত্ররা — জ্ঞানদাবাবু, নির্ম্মল, মনোজবাবু, নরেন, মিস্টার নন্দী, মিস্টার ভাদুড়ি। আশালতার গল্প উপন্যসের মতো নাটকেও প্রাধান্য বেশি। পরাধীন ভারতবর্ষে বসে লেখালেখি করলেও সেই সময়ের আশালতা সিংহের নায়িকারা যথেষ্টই আত্মস্বাতন্ত্র্যের

পরিচয় দিয়েছেন। তখনকার ভারতীয় সমাজে যে চেয়েছিল মেয়েরা ভালেবাসবে, অপেক্ষা করবে, প্রশ্ন করবে না, নিজের জীবন পরিবার নিয়ে ভাবিত না হয়ে শুধু স্বামীর ঘর করার জন্য উদ্‌গ্রীব হবে কারণ স্বামীর ঘরই মেয়েদের আসল ঘর। এমন সব ধারণাকে নস্মাৎ করেছেন। বরং খোলা মেলা পিতৃ পরিবারে শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ, স্বনির্ভর মানসিকতা এবং নিজের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে সচেতনতা মেয়েদের উদ্দীপিত করেছিল সমাজপ্রদত্ত ভূমিকা থেকে বেরিয়ে আসতে। 'সুরের উৎস' নাটকের নায়িকা ইন্দিরা এমনই এক মেয়ে। নির্ম্মলের মতো সৎচরিত্র পুরুষের প্রেমে কেবল নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে এমন কোন মানসিকতা নেই ইন্দিরার। তবে বিদ্রোহের হঠাৎ ঝলকানিতেও ইন্দিরা প্রদীপ্তা নয়। শান্ত প্রতিবাদে সমুন্নত সে। তাই তো তার মুখে শুনি — '... জীবনের দায়িত্ব যদি না নিলুম তবে স্বাধীনতার মানে কি রইল?'[৯] পিতা মারা যাওয়ার পর বিয়ে করে নিজের সংসার না গুছিয়ে সে মা-ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে চেয়েছে।

এরই পাশে ইন্দিরার মা মোহিনী দেবী আবার একটু সেকেলে। সংসারের প্রতিটি মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টায় দিন রাতের সমস্ত সময় আর শরীরের সকল সামর্থ্য ক্ষয়েই যেন ধরা দিত তাঁর জীবনের পরম সার্থকতা, তিনি যেমন সুগৃহিনী তেনি সু-মাতাও। মোহিনী দেবী কেবল জননী এবং পত্নী রূপেই বিরাজ করেছেন। তবে অসময়ে আবার তিনি অবিচলিতভাবে কর্তব্যও করে গেছেন, কোন বিপ্লবই তাঁকে বিক্ষিপ্ত করেনি।

আলোচ্য নাটকে আমরা পাচ্ছি শিক্ষয়িত্রী শান্তা দেবীকে। শান্তা মিত্র— ইতিহাসে এম.এম, ফার্স্টক্লাস। বছর ত্রিশের অবিবাহিত শান্তাদেবী সুশ্রী চেহারার, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য তাঁকে ব্যক্তিত্বময়ী করে তুলেছে। ইন্দিরার জন্য শান্তাদেবীর মমত্বও যথেষ্ট। ইন্দিরার মঙ্গলাকাঙক্ষী হয়ে তাকে তিনি অনেক সময় ব্যক্তিগত পরামর্শও দেন। শান্তা দেবীর চিন্তা ভাবনাও যথেষ্ট গভীর। মানুষের চরিত্রও তিনি অনুধাবন করতে পারেন। তবে মেয়েদের স্বাধীনভাবে উপার্জন করাকে তিনি যখন বলেন — '...কিন্তু মেয়েদের স্বাধীন জীবিকার পথে আমিও চিরকাল চলে এলুম। আমাদের দেশ ও পথে সম্মান নেই, মাধুর্য নেই। বড়ই রুক্ষ, নিরানন্দ।'[১০] শান্তা মিত্রের এ হেন মন্তব্য মেয়েদের জীবনের সার্থকতা কী সে তা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। এ কি নাট্যকার আশালতার মনোভাব নাকি, পুরুষ অনুসারী সমাজ যা চায় তা শান্তা মিত্রের মুখ দিয়ে জোর করে বলানো!

ইন্দিরার মাসতুতো বোন রূপে এ নাটকে আমরা পাই ফুল্লরা দেবীকে। প্রগতিশীল এবং রীতিমত ফ্যাশনদুরস্ত মেয়ে এই ফুল্লরা। মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিষয়েও ফুল্লরার মত খুবই স্পষ্ট।

এই নাটকে আমরা নারী চরিত্র রূপে আরও পাচ্ছি মিসেস ভাদুড়ী এবং তার মেয়ে রেবাকে।

মিস্টার ভাদুড়ির অল্প বয়সী মেয়েদের প্রতি যে দুর্বলতা আছে তা মিসেস ভাদুড়ি জানতেন আর

তাই মিসেস ভাদুড়ি তার মেয়ে রেবার জন্য ইন্দিরার মতো অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে শিক্ষয়িত্রী রূপে বহাল করতে চাইছিলেন না। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরাধীনতা এবং সন্তানের মুখ চেয়ে মিসেস ভাদুড়ি তাঁর স্বামীকে বরদাস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। রেবার মধ্যে ছাত্রীসুলভ বিনয় চোখে পড়ে না বা সে তার শিক্ষয়িত্রী ইন্দিরাকে যোগ্য সম্মান দেয় না। রেবার কথা-বার্তা, চাল-চলন উগ্র ধরনের।

'সুরের উৎস' নাটকে পুরুষ চরিত্রদের মধ্যে অন্যতম প্রধান চরিত্র জ্ঞানদাবাবু। পিতা জ্ঞানদাবাবুর উদারতা তাঁর মেয়ে ইন্দিরাকে শিক্ষিত করে, জ্ঞানের আভায় উজ্জ্বল করে, তাদের পরিবারের লোকেদের বাসকে সহনীয় করে তোলে।

এদেরই পাশে নির্ম্মল যে ইন্দিরার প্রেমিক, ভাবী স্বামী উদার শিক্ষিত যুবক, যাকে ইন্দিরার বাড়ির সকল কাজে সকলের পাশে থাকতে দেখা গেছে। ধনী এবং উচ্চশিক্ষিত বহু ডিগ্রিধারী হলেও তার মধ্যে একটা ধীর স্থির প্রশান্ত অমায়িকতা সকল সময় বিরাজ করে। শুধু ইন্দিরাকে নিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে একটা চাপা অভিমান দেখা গেছে।

নরেনের মধ্য দিয়ে আশালতা একজন শিক্ষিত বেকার যুবকের চিত্র এঁকেছেন। একটি চাকরী যোগাড় করতে সে হন্যে হয়ে ছুটেছে। শেষে অবশ্য নরেন তার বুদ্ধি বিবেচনায় একটি ছোটখাটো চাকরী জুটিয়ে নেয়। উদার, আধুনিক জ্ঞানদাবাবুর চরিত্রের পাশে ইন্দিরার মেসোমশায় মনোজবাবু চরিত্রকেও আমরা দেখি। মনোজবাবু মুখে আধুনিক প্রগতিশীল নারীদের সুখ্যাতি করলেও ঘরে গিয়ে নিজের পছন্দসই খাবার কিংবা বিশ্রামের সুব্যবস্থা না পেলে তার দস্তুরমতো রাগ হয়। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করতে পারেন না। তাই আধুনিক প্রগতিশীলতার বদলে গৃহকর্মে নিপুণা একটু সেকেলে স্ত্রী বা মেয়ে পেলেই হয়তো তিনি বর্তে যেতেন।

মিস্টার নন্দী আধুনিক সমাজের অত্যন্ত সুবিধাবাদী একটি চরিত্র। মেকি ভদ্রতা তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। মিস্টার ভাদুড়ি ধনী হলেও তার চারিত্রিক শিথিলতা তাকে সকলের কাছে ঘৃণার পাত্র করে তোলে। নারীকে মিস্টার ভাদুড়ি ভোগ্যবস্তুই মনে করেন।

নাটকের সংলাপ —

নাটকে সংলাপই মুখ্য, এককথায় সংলাপের মধ্য দিয়েই নাটককে চেনা যায়। নাট্যকার জীবন সম্বন্ধে তাঁর যাবতীয় ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ঘৃণা-ভালোবাসা প্রভৃতি প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি চরিত্রকে নির্বাচন করেন এবং সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কিছু আচরণ ও সংলাপের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করে। তবে এটাও ঠিক যে সংলাপ উচ্চারণ করবার সাথে সেই চরিত্রকেও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে

হয়। নাটকে বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা খুবই জরুরী কারণ নাটক দেখে বিভিন্ন রুচির মানুষ এবং নাটক দেখতে কাউকে বাধ্য করা চলে না। নাটকের চরিত্র যে প্রকৃতির হবে সংলাপের প্রকৃতিও হবে সেই রকম। চরিত্র অনুযায়ী সংলাপের যেমন বদল হয় নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ীও চরিত্রের সংলাপ বদল হয়।

উক্ত বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই নাট্যকার আশালতা সিংহ তাঁর দুটি নাটকের সংলাপ লিখেছেন। 'সুরের উৎস' নাটকে জ্ঞানদাবাবুর পরিবারের জ্ঞানদাবাবু স্বয়ং স্ত্রী মোহিনী দেবী, মেয়ে ইন্দিরা, ছেলে নরেন প্রত্যেকেই মার্জিত রাঢ়ী (চলিত)বাংলায় কথা বলেছেন। আবার ইন্দিরার মেশোমশায় মনোজবাবু, তার কন্যা ফুল্লরা দেবী — এরাও ঐ একই ভাষায় কথা বলেছেন। অন্যদিকে বন্ধুবর্গের মধ্যে মিস্টার নন্দী, শিক্ষয়িত্রী শান্তা দেবী — এরাও তাই। ইন্দিরা যেখানে গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর চাকরী নেয় সেই মিস্টার ভাদুড়ির পরিবারের সবাই এ শহরের কেতাদুরস্ত চলিত বাংলা ভাষাতেই অভ্যস্ত।

আসলে আশালতা তার আশপাশের পরিবেশে যেসব লোকজনের সান্নিধ্যে এসেছেন, যাদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তেমন রসদ নিয়েই নাটক সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারই তাঁর লেখায় বার বার উঠে এসেছে। এদিক দিয়ে আশালতার নাটকে সৃষ্ট চরিত্রদের মুখের ভাষা অত্যন্ত সাবলীল এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলেই মনে হয়।

শিক্ষিত, প্রগতিশীল, উদার মনোভাবাপন্ন, পেশায় অধ্যাপক অমায়িক জ্ঞানদাবাবুর মুখের মার্জিত ভাষা তার প্রতি পাঠক-দর্শকদের মনে শ্রদ্ধা জাগায়। তিনি যখন তাঁর স্ত্রী মোহিনীদেবীকে বলেন — 'মেয়েরা কি চিরদিনই জামার বোতাম পরানো আর বালিশের ওয়াড়ে ফুল তোলা — এই সব নিয়ে থাকবে? বৃহত্তর জগতে তাদের কোন দায়িত্ব নেই।'[১১]

আবার একটু প্রাচীনপন্থী কর্তব্যপরায়ণ মোহিনী দেবী যেন বাংলার মা-দেরই প্রতিনিধি। সংসারের সকলের সুখ সুবিধার জন্য তিনি সদা ব্যস্ত — '... ওমা তুমি যে অবাক করলে। জামার একটা বোতাম ছিঁড়লেই দরজীবাড়ী দৌড়তে হবে নাকি? আর বেয়ারা যে চা তৈরী করে, খোকা আর ইন্দু বলে অমন চা খাওয়ার চেয়ে না খেলেই হয়। তুমি কি মনে কর আমি যে কাজটি নিজে থেকে না দেখব, সেটি হবার জো আছে!...'[১২]

বুদ্ধিমতী, ধীর-স্থির, সংযত আধুনিক মেয়ে ইন্দিরার কথাবার্তায় রুচির ছাপ স্পষ্ট। প্রেমিক নির্ম্মল ইন্দিরাকে স্বাধীন উপার্জনের ক্ষেত্রে বাধা দিলে ইন্দিরা বলে — 'এই মনোভাব নিয়ে আপনি মেয়েদের স্বাধীনতার কথায় শতমুখ! জীবনের দায়িত্ব যদি না নিলুম তবে স্বাধীনতার মানে কি রইল?'[১৩]

বরং এর পাশে নির্ম্মলবাবুর চরিত্র তার শান্ত ধীর কথা বার্তার সাথে অনেকটাই নিস্প্রভ অন্তত

ইন্দিরার তুলনায়। ইন্দিরাকে নির্ম্মলবাবু বলেন — 'তোমাকে সকল কুশ্রীতা এবং সকল আঘাত থেকে রক্ষা করব বলেই তো আমি আছি।'[১৪]

আবার অতি আধুনিক কথা-বার্তায় কেতা দুরস্ত অথচ ভীষণরকম আত্মকেন্দ্রিক ফুল্লরার কথাবার্তাও তার চরিত্রের সঙ্গে মানানসই। ইন্দিরা যখন জন্মদিনের নিমন্ত্রণ পেয়ে তার মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে যাবে তখন ফুল্লরা বলে — 'মা আবার কি বলবেন? তোর ইচ্ছে হয় যাবি, না ইচ্ছে হয় যাবি নে। এত ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচির কথা।'[১৫]

তবে এমন প্রগতিশীল মেয়ে এবং স্ত্রী পেয়ে মনোজবাবু যে খুব সুখী তার কথায় অন্তত তা মনে হয় না। কারণ তিনি বলেন —

> ''...বামুনে কিংবা বাবুর্চ্চিতে যা তৈরী করে এনে দেয় খাই। কোন বিকার নেই, ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হলেই হল। কেবল অনেক রাত্রিতে কাজকর্ম্ম সেরে খেটেখুটে যখন বিছানায় এসে দেখি চাকর বেটা এমন ক'রে মশারি খাটিয়েছে যে সারা রাত্রি মশার কামড় খাওয়া ছাড়া উপায় নেই, তখন রীতিমত কষ্ট হয়।''[১৬]

এভাবেই নাট্যকর আশালতা সিংহ 'সুরের উৎস' নাটকে চরিত্রদের মুখে তাদের উপযোগী সংলাপ বসিয়ে নাটকটিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন।

'সুরের উৎস' নাটকে গান —

বাংলা নাটক প্রধানত পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অবলম্বনে রচিত হলেও বাঙ্গালী জাতির স্বাভাবিক সঙ্গীত প্রবণতার দিকেলক্ষ রেখে এতে বরাবর সঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। আধুনিক-পূর্ব বাঙ্গালীর ধর্মাচরণ ও সাংস্কৃতিক চর্চা বিশেষভাবে গানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য চর্যাগীতি, মঙ্গলগান, বৈষ্ণব পদ, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি গীত হবার উদ্দেশ্যেই রচিত হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য যে নাটক রচিত হল তা মধুসুদন দত্ত-দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির সময় থেকে প্রধানত এলিজাবেথীয় রোমান্টিক নাট্যরীতি অনুসরণ করলেও এতদিন ধরে যাত্রা-পাঁচালি প্রভৃতি দেশীয় নাট্যধারায় যে সংগীতময়তার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়ে আসছিল এবং বাঙালীর চিত্তে যে সংগীত রসাশ্রিত নাটকের সংস্কার গড়ে উঠেছিল তাকে

উপেক্ষা করা সম্ভব হল না। সেজন্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের মধ্যেও সংগীত একটি অপরিহার্য অঙ্গ রূপে স্থান পেল। সংগীতের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল পরিচিত বস্তুসীমা থেকে মনকে মুক্তি দেওয়া। নাটকের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এবং চিত্তের অনবরত উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বের ফলে মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সংগীতের সুধারস দর্শক চিত্তকে বিশ্রান্ত ও পরিতৃপ্ত করে। এর অপর উদ্দেশ্য অবশ্যই দর্শকের সংগীত পিপাসা চরিতার্থ করা। নাটকের ভাব-পরিবেশ রচনাতেও গান অনেকসময় বিশেষ উপযোগী হয়। দৃশ্যের সূচনাতে সঙ্গীতের অবতারণা করে নাট্যকার অনেক স্থলে বিশেষ একটি ভাবগজৎ সৃষ্টি করেন এবং এর ভাষা ও সুরের মধ্য দিয়ে দর্শক চিত্তে বিশেষ কোন ভাবাবেগের সঞ্চার করে থাকেন।

অনেকসময় সংগীতের সুকৌশল প্রয়োগে নাটকীয় উৎকণ্ঠা বর্ধিত হয় এবং ঘটনাবেগ প্রবল ও দ্রুত হয়ে ওঠে। গানের মধ্যে দিয়ে গায়ক বা গায়িকার নিজস্ব অন্তরের কোন বাসনা ও আবেগ প্রকাশ পায়, কিংবা নিকটস্থ কোন চরিত্রের প্রচ্ছন্ন ভাব ও গূঢ় প্রবৃত্তি উন্মোচিত হয়। নাটকে সুকৌশলে গানের প্রয়োগ করা হলে যেমন নাট্যরস ঘনীভূত হয় ও দর্শক চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় তেমনি আবার অকারণে অস্থানে গানের অবতারণা হলে কিংবা গান অত্যধিক দীর্ঘ এবং সংখ্যায় মাত্রাতিরিক্ত হলে নাটকের রস তরল হয়ে পড়ে এবং দর্শকও বিরক্ত হয়ে ওঠে।

আশালতা সিংহের নাটক 'সুরের উৎস' তে সংগীতের স্থান নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের উক্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখতেই হয়। আশালতা বাড়িকে গানের বাড়ি বললেও অত্যুক্তি হয় না বলে, মন্তব্য করেছিলেন প্রখ্যাত গবেষক লেখক তপোব্রত ঘোষ মহাশয়। আশালতা নিজে মার্গ সঙ্গীতের রেওয়াজ করতেন। প্রগতিশীল রোমান্টিক আশালতা তাঁর নাটকে গানের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ ভাব ও আবেগ পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। তাঁর নাটকে গানের প্রয়োগ কখনোই অকারণ, মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ বলে মনে হয়নি আমাদের। 'সুরের উৎস' নাটকে মোট ছয়টি গানের যথাযথ প্রয়োগ নাটকীয় উৎকণ্ঠা, ঘটনাবেগকে ত্বরান্বিত করে চরিত্রের প্রচ্ছন্নভাব এবং গূঢ় প্রবৃত্তি উন্মোচনের সহায়ক হয়ে উঠেছে।

যে গানগুলি নাট্যকার নাটকে রেখেছেন তার মধ্যে প্রথম গানটি প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি রয়েছে। নায়িকা ইন্দিরা এস্রাজ সহ তা পরিশেন করেছে।

দ্বিতীয় গানটি অতুল প্রসাদ সেনের বিখ্যাত গান 'বধুঁয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে, তুমিও একাকী আমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে'[১৭] — এ গানটিও ইন্দিরার কণ্ঠে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতেই রেখেছেন নাট্যকার। দৃশ্যের শুরুতেই গানটি রেখে আসন্ন পরিবেশের খানিকটা আভাস হয়তো দিতে চেয়েছেন নাট্যকার আশালতা সিংহ। এই গানের মধ্য দিয়ে নায়িকা ইন্দিরার আবেগঘন বিরহী

রূপ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। গান চলাকালীন প্রেমিক নির্ম্মলের ঐ ঘরে প্রবেশ পরিবেশকে আরও তাৎপর্যমন্ডিত করে তোলে।

প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যেও রয়েছে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। এ গানটিও গেয়েছেন ইন্দিরা।

চতুর্থ গানটি আমরা শুনতে পাই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে। গজল গানটি গেয়েছেন ইন্দিরার মাসতুতো বোন ফুল্লরাদেবী। ইন্দিরার জন্মদিনের পার্টিতে সকলেই যখন তার গান শুনতে আগ্রহী সে সময় পিতার অসুস্থতার জন্য উদবিগ্ন ইন্দিরা গান গাইতে পারে না, গান গায় ফুল্লরা। ফুল্লরা ফ্যাশন দুরস্ত মেয়ে। তাঁর গান যেন তার চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

পঞ্চম গানটি বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর'[১৮] — পদাবলী কীর্তনের এই গানটি নাট্যকার প্রয়োগ করেছেন শান্তাদেবীর একাকিত্ব উন্মোচিত করতে। নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ষষ্ঠ গানটি নাটকের সমাপ্তিতে। এটিও বিদ্যাপতির পদ — 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারেণু / নয়ন না তিরপিত ভেল'[১৯] নাটকে পরিসমাপ্তিতে নির্ম্মল-ইন্দিরার মিলন দৃশ্যে গানটি পরিবেশকে আরও রসাদ্র করে তোলে।

'পুনরাবৃত্তি' —

আশালতা সিংহের দ্বিতীয় নাটক 'পুনরাবৃত্তি' — তিনটি অঙ্ক এগারোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ আশ্বিনের 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। নাটকটিতে যেসব - চরিত্র আছে সেগুলি হল — নীরেন্দ্র সেন, নীরেন্দ্রর মা বামা সুন্দরীদেবী, নীরেন্দ্রর দিদি মণিমালিকা, মণিমালিকার স্বামী কামাক্ষ্যা প্রসাদ। অন্যদিকে রয়েছে রাজেন্দ্র মল্লিক, তাঁর বোন শিপ্রাদেবী, এছাড়া রয়েছে সুবোধ রায়, গ্রামের মেয়ে বাণী, বাণীর মা হরকালী দেবী।

'পুনরাবৃত্তি' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখি পল্লীগ্রামের একটি সাধারণ বাড়ি। বাড়িটা নীরেন্দ্র সেনের গ্রামের বাড়ি। নীরেন্দ্র বিধবা মা এবং দিদি, যে দিদির কোলকাতায় শ্বশুরবাড়ি — পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। নীরেন্দ্রর মা বামা সুন্দরী চিঠিপত্র লিখে মেয়েকে কোলকাতা থেকে এখানে এনেছেন। উদ্দেশ্য একটাই, তা হল — ছেলে নীরেন্দ্রর বিয়ে দিতে চান বামা সুন্দরী গ্রামেরই মেয়ে বাণীর সাথে। কিন্তু নীরেন্দ্র এই বিয়েতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। তাই নীরেন্দ্রর মা মেয়ে মণিমালাকে ধরেছেন যে করেই হোক নীরেনকে রাজি করাতে হবে। মণিমালিকা তার মা কে বোঝাবার

চেষ্টা করে যে 'নীরেন আজকালকার ছেলে, ও যদি বিয়ে করতে না চায় তুমি হাজার বোঝালেও করবে না।'[২০] কিন্তু বামা সুন্দরী গ্রামের বাণীর মা হরকালীদেবীকে একরকম কথা দিয়ে ফেলেছেন যে, তিনি তাঁর মেয়েকে পুত্রবধূ করবেনই। এদিকে নীরেন স্টেটস স্কলারশীপ নিয়ে বিলেত যেতে যায়। আর নীরেনের মা ছেলের বিয়ে দিয়ে তার বিলেত যাওয়া আটকাতে চান।

নীরেনের মুখেই দিদি মণিমালিকা সিপ্রা নামে একটি মেয়ের কথা জানতে পারেন, সিপ্রার প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে নীরেন খানিকটা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বোঝা যায় নীরেন সিপ্রাকে পছন্দ করে। সিপ্রা অর্গান বাজিয়ে গান গায়। সিপ্রার দাদার সঙ্গে নীরেনের বন্ধুত্ব রয়েছে। সুবোধ রায়ের সাথে সিপ্রার বিবাহের একটা কথাবার্তা চলছে। তাঁদের আত্মীয় স্বজনেরাও সেটাই জানে। নীরেনের মা গ্রামের মেয়ে বাণীর সঙ্গে নীরেনের বিবাহের বন্দ্যেবস্ত করছে — একথা শুনে সিপ্রা বলে যে নীরেনের '...দস্তুর মত বিদ্রোহ করা উচিত।'[২১] সুবোধ কিন্তু একথা বলে না।

তৃতীয় দৃশ্যের শুরুতে আবার নীরেন্দ্রর গ্রামের বাড়ির প্রাঙ্গণে দেখা যায় বামা সুন্দরী এবং মণিমালিকার মধ্যেকার কথোপকথন। মণিমালিকার হাতে নীরেন্দ্রর একটি চিঠি। হরকালীও সেখান এসেছেন। হরকালী দেবী শুনেছেন যে নীরেন বিলেত যাচ্ছে তাই সংবাদটির সত্যতা যাচাই করতে সে এখানে ছুটে এসেছেন। বামা সুন্দরী খানিকটা ভেঙ্গে পড়েছেন; মণিমালিকা হরকালীদেবীকে বলে যে বাণী মেয়েটি খুবই ভাল 'কিন্তু এ যুগের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে মেয়েকে যা যা শেখানো দরকার আপনি তা শেখাননি।'[২২] বাণীকে তার সঙ্গে কোলকাতায় নিয়ে যেতে চান মণিমালিকা। বাণীর মা হরকালীও বাণীকে মণিমালিকার সঙ্গে কোলকাতায় পাঠিয়ে দেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় রাজেন্দ্র মল্লিকের ড্রইংরুম। নীরেন তার বন্ধু রাজেন্দ্রকে তার লেখা একটি কবিতা শোনাতে আসে। কিন্তু রাজেন্দ্র এখন কবিতা নয়, নাটকে মজে আছে। কথায় কথায় শিপ্রা যখন নীরেনের মায়ের ঠিক করা গ্রামের বাণী মেয়েটির কথা জানতে চায় তখন নীরেন জানায় যে সেটাই তার এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা কারণ তার দিদি মেয়েটিকে কেলাকাতায় নিয়ে এসে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অনেকটা সফলও হয়েছেন। তাই নীরেণকে তলব করেছেন মেয়েটিকে একবার দেখে আসার জন্য। সুবোধ একথা শুনে নীরেনের এই আশঙ্কাকে একেবারেই অমূলক বলে খারিজ করার চেষ্টা করে। এতে ক্ষিপ্ত সিপ্রা নীরেনকে এর একটা সোজা সমাধানের সন্ধান বলে দেয়। বলে যে ঐ পাড়াগাঁর অর্ধশিক্ষিত বাণীর সঙ্গে সুবোধের বিয়ের আয়োজন হলেই ঠিক হয়। এতেও অবশ্য সুবোধ মোটেই বিচলিত হয় না।

এই অঙ্কেরই দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখি হ্যারিসন রোডের মণিমালিকার বাড়ির সুসজ্জিত একটি কক্ষ। মণিমালিকা বাণীকে এখানে নিয়ে এসে যতই তার ভাইয়ের জন্য তাকে আধুনিক মার্জিত রুচিসম্পন্না

করে গড়ে তুলুন বাণীর এসব করতে কিন্তু যথেষ্ট আত্মসম্মানে লাগে। নীরেন্দ্র সুবোধকে তাঁর দিদির বাড়িতে নিয়ে আসে। বাণী যখন এদের দুজনের সামনে আসে তখন তার পরণে সাধারণ শাড়ি হলেও 'মধুর লজ্জার পরিবর্তে মুখে কিছু দৃঢ় কঠোরতার ভাব।'[২৩] এই অঙ্কেরই তৃতীয় দৃশ্যে দেখি সিপ্রার বাড়িতে নীরেন্দ্রর দিদি মণিমালা এসেছেন। মণিমালা সিপ্রাকে জিজ্ঞেস করে কেন তারা নীরেন্দ্রর বিলেত যাবার আগেই বিয়ে করছে না। এদিকে সুবোধ চিঠি লিখে মণিমালাকে জানিয়েছে যে সে বাণীকে বিয়ে করতে চায় যদি বাণীসহ তার আত্মীয় পরিজনের এ বিয়েতে কোন আপত্তি না থাকে। তাই মণিমালিকা সিপ্রার কাছে এসে নীরেন্দ্র ও সিপ্রার কাছে সুবোধের বিষয়ে জানতে চায়। নীরেন্দ্র তার দিদিকে আশ্বস্ত করে বলে যে, সুবোধ শুধু ভাল মনেরই নয়, সে যথেষ্ট ধনীও বটে এবং নামকরা ব্যারিস্টার।

এই অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেখি রাজেন্দ্র মল্লিক যিনি সিপ্রার দাদা তারই বাড়িতে সিপ্রা এবং নীরেন্দ্রর বাকদান উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানে নীরেনের দিদি মণিমালিকা এবং জামাইবাবু কামাক্ষ্যা প্রসাদ যেমন নিমন্ত্রিত তেমনি সুবোধ এবং তার স্ত্রী বাণীও এসেছে। বাণীর মিষ্টিস্বভাবের জন্য নীরেন্দ্র এবং সিপ্রাও আজকাল ওর ভক্ত হয়ে উঠেছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখি বার-এট-ল মিস্টার সুবোধ রায় এর সুদৃশ্য বাড়ি। এই বাড়ির গৃহকত্রী এখন বাণী। সিপ্রা ও নীরেনদ্রর আজ এদের এখানেই নিমন্ত্রণ। বাণী চা-এর ব্যবস্থা করতে গেলে সুবোধ কোন এক অজুহাতে নীরেন্দ্র এবং সিপ্রাকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে বাগান থেকে ঘরে আসে। নীরেন্দ্র সিপ্রাকে একা পেয়ে বলে - 'মনে হয় যা প্রমাণ করতে চাই হৃদয় তা চায় না।'[২৪] সিপ্রাও বলে বাণীর কাছে এসেই আরও — 'কত কি যে স্বপ্নের মতো মনে হয় নিজেই ঠিক বুঝতে পারি নে।'[২৫] বোঝা যায় বাণীর সংসার, বাণীর মন - মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সিপ্রা-নীরেন্দ্র উভয়েরই ধ্যান ধারণাগুলো ধাক্কা খেতে শুরু করেছে।

এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় নীরেন্দ্রর মা ছেলের বিলেত থেকে আসার অপেক্ষায় দিন গুণছেন। হরকালীও মেয়ে বাণীকে কোলকাতায় সুবোধের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একা। তিনিও উপলব্ধি করেন যে, 'আমাদের ছেলে মেয়েরা আর আমাদের ঘরোয়া গণ্ডীটুকুর মাঝে থাকবে না।'[২৬]

এই অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দেখি সিপ্রার শয়ন কক্ষ। সিপ্রা সেখানে নীরেন্দ্রর থেকে পাওয়া একখানা চিঠি হাতে নিয়ে। দেখে তাকে মনে হচ্ছে সে চিঠি সে বহুবার পড়েছে। বাণী এর আগে সিপ্রার লেখা নীরেনের জন্য, চিঠি দেখেছিল যদিও সেটা সে সিপ্রার অলক্ষে তাকে না জানিয়েই দেখেছিল এবং সেই চিঠি সিপ্রার ইবসেন ক্লাবের কথাতেই ভর্তি - তাদের কথা, তাদের বক্তৃতা। বাণী জানায় এ ধরনের চিঠি কি কোন প্রেমিকের প্রেমিকার কাছ থেকে পেলে ভালো লাগবে যেখানে তাদের নিজেদের কোন কথা নেই? সিপ্রাও সেটা উপলব্ধি করে।

এই অঙ্কেরই চতুর্থ দৃশ্য মণিমালিকার বাড়ির এক তলায় মণিমালিকা এবং তার স্বামী কামাক্ষ্যাবাবু বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কারণ তারা নীরেণকে নিতে স্টেশনে যাচ্ছেন, নীরেন্দ্র দেশে ফিরছে। তারা যখন স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন তাঁর মিনিট পাঁচেক পরে নীরেন্দ্র এসে উপস্থিত হল একাই তাঁর দিদির বাড়ি; পরনে তার ধুতি ও চাদর।

বাড়ির ভৃত্য চতুরিয়ার মুখে নীরেন যখন শুনল তার দিদি-জামাইবাবু তাকে আনতে এইমাত্র স্টেশনে গেছেন তখন সিপ্রা বোঝে যে সে দেরি করে এসেছে তাই তার জন্য তারা অপেক্ষা করতে পারেনি আর এসব ছাড়াও সিপ্রার স্টেশনে যেতে কেমন যেন একটু নার্ভাসও লাগছিল। সিপ্রা যখন উপরে ঘরে ঢোকে তখন হঠাৎ করে নীরেন্দ্রকে দেখে এবং অবাক হয়। উভয়ের মধ্যে কুশল বিনিময়ের সময় হঠাৎ সিপ্রার নজর পড়ে নীরেন্দ্র হাতে সিপ্রার ফাটোটির দিকে। নীরেন নিজেকে সংবরণ করে নেয় এবং নীরেনকে সিপ্রা উচ্ছসিত হয়ে বলে '... নারী প্রগতির কথা বলতে গেলে আগে ইবেসেনের কথাই মনে পড়ে'[২৭] আর তাই তাদের ক্লাবেরও ঐ নাম।

নীরেন কিন্তু ইবসেন নয় বরং অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একান্ত ভক্ত হয়ে পড়েছে। বিলেত যাবার আগে বাণী তাকে শরৎ-রচনাবলী উপহার দিয়েছিল। নীরেন্দ্রর কথায় — 'আমাদের দেশের মেয়েদের আত্মবোধ জাগাতে তিনি যা করে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার।'[২৮]

নাট্য দ্বন্দ্ব —

দ্বন্দ্ব ছাড়া নাটক হয় না। 'সুরের উৎস' নাটকে যেমন দ্বন্দ্ব রয়েছে 'পুনরাবৃত্তি' নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। এই নাটকে একদিকে যেমন প্রাচীন গ্রাম্য ধ্যান ধারণার সঙ্গে আধুনিক শহুরে সভ্যতার ধ্যান ধারণার দ্বন্দ্ব রয়েছে তেমনি নীরেন্দ্রর নিজের মধ্যে চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব দেখা গেছে, নিজের বিয়েকে কেন্দ্র করে। এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে কমবেশি অনেকেই জড়িয়ে পড়েছে। যেমন জড়িয়ে পড়েছে সিপ্রা তেমনি মণিমালিকা তেমনি আবার সুবোধবাবুও।

নীরেন গ্রামের মেয়ে বাণীকে প্রথমে বিবাহ করতে এমনকি দেখতে পর্যন্ত চায়নি। শহরের স্মার্ট-শিক্ষিত-গান জানা সিপ্রাকে পছন্দ করেছে নীরেন। কোলকাতায় দিদি মণিমালিকা বাণীকে নিয়ে এসে শহুরে সভ্যতায় শিক্ষিত মার্জিত আধুনিক রপে গড়ে তুললেও নীরেন নিজেকে নয়, সুপাত্র হিসাবে সুবোধকে এ ব্যাপারে এগিয়ে দেয়। সুবোধ-বাণীর বিয়ে হওয়ার পরে তাদের সঙ্গে মেলা-মেশার পর নীরন্দ্র-সিপ্রা উভয়েই বাণীর ভক্ত হয়ে পড়ে।

নাট্য চরিত্র —

'পুনরাবৃত্তি' নাটকে প্রধান নারী চরিত্ররা হল — সিপ্রা, বাণী, মণিমালিকা, বামাসুন্দরী, হরকালী। সমাজ মেয়েদের বিষয়ি (Subject) হিসাবে নয়, বিষয় (Object) হিসাবে দেখতেই অভ্যস্ত, সেটাই সমাজের চাহিদা। শাস্ত্রকাররাও মেয়েদের কুচ্ছ্র সাধনে বাধ্য করতেই চেয়েছেন সে কৃচ্ছ্রসাধন মেয়েটির ব্যক্তি ত্বের স্ফুরণের জন্য নয়, ব্যক্তিত্বের বিনাশের জন্যই।

পুনরাবৃত্তি নাটকে সিপ্রা একটু অন্য ধাঁচে গড়া। এই সিপ্রার কাছে জীবন তার নিজস্ব, সেখানে সমাজের খবরদারি নিষ্ফল। সিপ্রা শিক্ষিতা, সপ্রতিভ, আচার-আচরণে উগ্র নয়। আধুনিক মেয়ের জীবন কেমন হওয়া উচিত তার একটা ধারণা আছে তার। সংসার খাঁচার মধ্যে অধিকাংশ মেয়ে যেমন সার্থকতা খুঁজতে যায় সিপ্রা তেমন মোহগ্রস্ত নয়। বিয়ের মন্ত্রকে ওর পায়ের শেকল হতে দিতে চায়নি সে প্রথমে। কিন্তু পরে তাকে অবশ্য সমাজানুসারী মেয়ে হিসাবেই দেখান নাট্যকার। বাণী মেয়েটি সহজ সরল সহনশীল হলেও যথেষ্ট আত্মমর্যাদাসম্পন্না গ্রামের মেয়ে হলেও বাণীর চিন্তা-চেতনা যে যথেষ্ট গভীর তা বোঝা যায়।

নীরেন্দ্রর দিদি মণিমালিকাও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মহিলা। গ্রামে ছোটবেলা কাটলেও বিয়ের পর কোলকাতায় থাকে, তাই নাগরিক জীবনের আদব কায়দাও ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে নেয়। পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে কাজ করার ক্ষমতা রাখে।

নীরেন্দ্রর মা বামাসুন্দরী গ্রাম্য সহনশীল মা দেরই প্রতিনিধি। বাণীর মা হরকালীদেবী তৎকালীন গ্রাম সমাজ পরিবেশে থাকলেও প্রগতিশীল চিন্তাধারায় নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন।

'পুনরাবৃত্তি' নাটকে প্রধান পুরুষ চরিত্রদের মধ্যে পাচ্ছি নীরেন্দ্র, সুবোধ, কামাক্ষ্যাবাবুকে। এছাড়া সিপ্রার দাদা রাজেন্দ্র মল্লিককেও আমরা দেখছি এই নাটকে।

নীরেন্দ্র গ্রামের মেয়ে বাণীকে প্রথমে বিবাহ করতে এমনকি দেখতে পর্যন্ত চায়নি। শহরের স্মার্ট, শিক্ষিত-গান জানা সিপ্রাকে সে পছন্দ করেছে। কোলকাতায় দিদি মণিমালিকা, বাণীকে নিয়ে এসে শহুরে সভ্যাতায় তাকে শিক্ষিত, মার্জিত, আধুনিক রূপে গড়ে তুললেও নীরেন্দ্র নিজেকে নয় সুপাত্র হিসাবে সুবোধকে এ ব্যাপারে এগিয়ে দেয়। নীরেন্দ্রর তো গ্রামেই বাড়ি ছিল। সে গ্রামেরই ছেলে। লেখাপড়ার সূত্রে শহরে এসেছে। গ্রামে তার মা থাকেন তাই মাঝে মাঝে সে গ্রামে যায়। নীরেন্দ্রর মা দিদি তকে বোঝাতে পারন বাণী সুবোধের স্ত্রীরূপে যখন সুচারুভাবে ঘর গৃহস্থালী সামলায় তা দেখে নীরেনের ভুল ভাঙ্গে সে তখন উপলব্ধি করে ঘরে আরাম আয়েষের সাথে শান্তি বজায় থাকবে বাণীর মত সহনশীল স্ত্রী পেলেই আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বময়ী সিপ্রার মত মেয়েকে হয়তো দূর থেকেই

বেশি ভালো লাগে। তাই সিপ্রার চরিত্র বাণীর চরিত্রের আদলে গড়ে উঠলেই তার পক্ষে মঙ্গল। তাই নীরেন্দ্র ভালোলাগা-মন্দ লাগার উপরই যেন নাটকের বাণী ও সিপ্রার চরিত্র ওঠে-নামে। এই নাটকে সুবোধ ধনী, ব্যরিস্টার সৎ চরিত্রের যুবক। সুবোধের সঙ্গে প্রথমে সিপ্রার বিবাহের কথাবার্তা চলছিল, সিপ্রার সঙ্গে তার মানসিকতা না মেলায় সেই বিবাহ নাকচ হয়ে যায়। সুবোধ যথেষ্ট স্থিতধী পুরুষ, তবে মেয়েদের সম্পর্কে তার কি ছু সেকেলে মতাদর্শ আছে। তাই আধুনিক মানসিকতার মেয়েদের সে হয়তো সব সময় বুঝে উঠতে পারে না।

পুনরাবৃত্তি নাটকের কামাক্ষ্যাবাবু মণিমালিকার স্বামী, একেবারেই ছা-পোষ মাঝবয়সী ভদ্রলোক। স্ত্রীর সঙ্গে কামাক্ষ্যাবাবুর বোঝাপড়া খুব ভালো তাই মণিমালিকা অনায়াসে গ্রামের যুবতী বাণী মেয়েটিকে নিজের কাছে এনে আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলে। কামাক্ষাবাবুর মত উদার, স্নেহশীল ভদ্রলোক সে যুগে বেশি ছিল বলে মনে হয় না।

নাটকের সংলাপ —

প্রথম নাটক সুরের উৎস এর মত এই নাটকেও নাট্যকার আশালতা সিংহ চলিত রাঢ়ী বাংলা ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে সংলাপকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের মত নাটকেও আশালতা সংলাপ রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। দু একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়ট আরও স্পষ্ট হবে।

বাণী মেয়েটি গ্রামের সহনশীল মেয়ে তবুও সে মণিমালিকা বলে —

‘ ‘কেন দিদি আমাকে ঝক্ ঝক্ পালিশ করে বাজারে বিক্রীর জন্য বার করতে চাও?’’[২৯] আবার মণিমালিকাও অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন সে তার অবুঝ মা কে বোঝায় এবং বলে —‘‘নীরেন আজকালকার ছেলে, ও যদি বিয়ে করতে না চায় তুমি আমি হাজারর বললেও করবে না।’’[৩০] আবার নীরেন্দ্র-মণিমালিকার মা বাংলা গ্রামীণ মায়েরই প্রতিনিধি কিন্তু বাণীর মা গ্রামের মহিলা হলেও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন চলতে শিখে গেছেন তাই তিনিও নীরেন্দ্রর মা বামাসুন্দরীকে বলেন — আমাদের ছেলেমেয়ের আর ঘরোয়া গন্ডীটুকুর মধ্যে থাকবে না।’’[৩১] সিপ্রা তো আধুনিক মেয়ে। তাই তার কথাতেও আধুনিকতার ছাপ। ‘‘...নারী প্রগতির কথা বলতে গেলে আগে ইবসেনের কথাই মনে পড়ে...’’[৩২] । পুরুষ চরিত্রদের মধ্যে নীরেন্দ্র জটিল চরিত্র এবং আত্মকেন্দ্রিক আধুনিকতাও যথেষ্ট রয়েছে তাঁর মধ্যে। তার মা-দিদি অনে বুঝিয়েও তাকে যা বোঝাতে পারেনি সুবোধ বাণীর সংসার দেখে সে যেন তা আচিরেই বুঝতে পার। তাই সে সিপ্রাকে বলে — ‘‘মনে হয় যা প্রমাণ করতে চাই হৃদয় তা চায় না।’’[৩৩] আধুনিক, শিক্ষিত, স্মার্ট মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও পুরুষের সুখ-সুবিধা, ঘর-গৃহস্থালী সামলানোর জন্য গৃহকর্ম

নিপুণা সহনশীল মেয়েই যে বেশি ভালো সেই বোধ নীরেনের জাগে যখন সে দেখে ধনী ব্যারিস্টার সুবোধের ঘর গৃহস্থালী গ্রামের মেয়ে বাণী স্ত্রী হয়ে এসে কেমন নিপুণভাবে সামলাচ্ছে তাই উপন্যাসের শেষে নীরেনের উপলব্ধি — ''আমাদের দেশের মেয়েদের আত্মবোধ জাগাতে তিনি যা করে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার।''[৩৪] এই তিনি হচ্ছেন কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সুবোধ বরাবরই সেকেলে পুরুষ তবে কখনোই অত্যাচারী দুর্মুখ নন। তার কথায় — ''নারীর কাছে সমস্ত কালের সব পুরুষের প্রার্থনা একই।... স্ত্রীর কাছে তারা চায় শান্তি, চায় নির্ভরতা।''[৩৫]

নাটকের গান —

'সুরের উৎস' নাটকের তুলনায় এই নাটকে গানের সংখ্যা কম এবং গানগুলি কোন্ গান সেকথাও নাট্যকার আশালতা সিংহ এ নাটকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেননি। এই নাটকে মোট তিনটি গান রয়েছে। তবে গান গুলির প্রয়োগ কখনোই অকারণ নয়। নাটকীয় ঘটনাবেগকে ত্বরান্বিত করে চরিত্রের ভাব এবং প্রবৃত্তি উন্মোচনে গানগুলি সহায়ক হয়ে উঠেছে।

প্রথম গানটি প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মল্লিক বাড়িতে সিপ্রার যা নিজেদের বাড়িতে সেখানে সিপ্রার কণ্ঠে গান।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বাণীর কণ্ঠে গান রয়েছে। মণিমালিকার বাড়িতে থাকাকালীন মণিকালিকাই বাণীকে গান শেখায় এবং গান করতে বলেন।

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যেও গান রয়েছে। এটাও বাণীর কণ্ঠে।

'পুনরাবৃত্তি' নাটকে দেখা যায় শহুরে আধুনিক মেয়ে তার স্বকীয়তা ভুলে শেষে গ্রামের অর্ধশিক্ষিত প্রায় অশিক্ষিত অথচ নিপুণভাবে স্বামী সংসারের নিয়োজিত বাণীকেই শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে শহুরে শিক্ষিত মেয়েটিকে গ্রামে বসবাস করতে হয়তো হয়নি কিন্তু গ্রামের মেয়ের কাছে তাকে দীক্ষা নিতে হল। শহুরে আধুনিক মেয়েটির ভাবী স্বামী যে স্বয়ং গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও বিয়ের ব্যাপারে প্রথমে গ্রামে অর্ধশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে প্রবল আপত্তি করে। সেই যখন দেখল সেই গ্রাম্য মেয়েটি স্বামী সেবা এবং সংসার করছে তখন তার সুবিধাবাদী পুরুষ মন প্রমাদ গণে এবং নিজের ভাবী স্ত্রীকে শরৎসাহিত্যের নারীদের উদাহরণ দিয়ে বলে যে এই দেশের মেয়েদের আত্মবোধ জাগাতে শরৎচন্দ্রের জুড়ি নেই। সত্যি, শরৎচন্দ্রের মতো পুরুষই শুধু এদেশের মেয়েদের আত্মবোধ জাগাতে পারেন কারণ

কুসংস্কার, ধর্মের, সমজের দোহাই দিয়ে এদেশের মেয়েদের শোষণ করা হত এবং হয়, অন্য প্রগতিশীল দেশে কখনই তা সম্ভব নয়। আশালতার লেখা বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসে দেখা যায় গ্রামের গৃহকর্মনিপুণা, গৃহলক্ষ্মী মেয়েরাই সকলের ভালোবাসা পায়, সমাজ তাদেরই ভালো চোখে দেখে কিন্তু এর বিপরীতে গেলেই সমাজপতিরা হায় হায় করে ওঠেন।

আশালতা সাহিত্য চর্চা করলেও শ্বশুর বাড়ির লোকেদের আপত্তির জন্য তাঁর পক্ষে বাড়ির বাইরে বেরোনো সম্ভবপর হত না। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল চিঠি-পত্র আদান প্রদান। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বহু সাহিত্যিক, জ্ঞানী, গুণী মানুষেরা আশালতাকে পত্র দিত। সেইসব কিছু পত্র নিদর্শন স্বরূপ আমরা দেখতে পারি।

শ্রীমতী আশালতা সিংহকে লেখা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যয়ের চিঠিখানি নিম্নে হুবহু তুলে ধরা হল[৩৬] —

শ্রীযুক্তা আশালতা দেবী,

শ্রদ্ধাস্পদাসু

সবিনয় নিবেদন

আপনার পত্র পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। বিস্মিতও কম হইনি। অমিতার প্রেম চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করর অনুমতি নেবার জন্যে যিনি আপনার কাছে গেছেন আমার অনুমতি নেওয়া দূরের কথা, তাঁকে কোনদিন আমি চোখেও দেখিনি। এখন মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে পেন্সিসলে লেখা এক টুকরো কাগজে আমি আমার বাড়ীতে দেখেছিলাম — কোনও এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখা না পেয়ে লিখে রেখে গেছেন — '' 'অমিতার প্রেম' উপন্যাসখানির চিত্রনাট্য লিখে আমি আপনাকে দিতে চাই।'' — এই পর্যন্ত। এর বেশি আর আমি কিছু জানি না।

অমি কাজে বেরিয়ে যাই সকালে। ফিরি আমি অনেক রাত্রে। যদি ডাক্তার সিংহ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে যান তাই আমি কাল স্টুডিয়ো যাবার পথে ধর্মতলা হয়ে নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা হয়নি। আপিসে জানিয়ে এসেছি — আজ সকালে তাঁর জন্যে আমি বাড়ীতেই থাকবো। এখন তার আসার অপেক্ষায় বসে আছি আর আপনাকে এই চিঠি লিখছি।

আপনার লেখার আমি একজন ভক্ত পাঠক। অনেক দিদন থেকে অনেক লেখাই আপনার পড়েছি। অমিতার প্রেম নিশ্চয়ই পড়েছি। কিন্তু এখন আর তার গল্পটি আমার মনে পড়ছে না। আমার লোককে কালই এক কটি বই আমি আনতে বলেছি আর একবার পড়ে দেখি। সত্যিকার যারা গল্প লিখিয়ে তাদেরই লেখা গল্প সিনেমার ছবিতে রূপান্তরিত হওয়া উচিত। আমার সাহিত্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করে

সিনেমায় আসবার গোড়ার কথা এই। তবে আমার ধারণা — সিনেমার জন্যে নতুন করে গল্প লেখা উচিত। সিনেমাকে সাহিত্য বা নাট্যসাহিত্যের পর্য্যায়ে তোলা কোনদিনই সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সিনেমার এদের অনেক নীচে।

যাই হোক, এই সূত্রে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো — এই আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার বাড়ীর পাশ দিয়ে আমি কতবার গেছি, কিন্তু সাহস হয়নি — নিজে গিয়ে পরিচয় করবার। আমি দেশে যাই খুব কম। যাবার অবসর পাই না। তবে যাই যখন তখন দুবরাজপুর হয়েই যেতে হয়। এবার গেলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

আশা করি কুশলে আছেন। ইতি —

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সিংহি মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হলো। অনেককাল আগে পরিচয় হওয়া উচিত ছিল। এখন হলো। বই পেলাম।

আশালতাকে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্র[৩৭] —

(পত্রটি ১৭জুলাই লেখা হলেও কোন সালে লেখা হয়েছিল তা জানা যাচ্ছে না।)

১৭ই জুলাই

THE UNIVERSITY
LUCKNOW.

কল্যানীয়াসু,

তোমার (লিখতে সঙ্কোচ হলেও), তোমার চিঠি পেয়ে সত্যিই ভাল লাগল। উৎসর্গ করতে চেয়ে আমাকে ধন্য করেছ। এতে আমার গৌরবই বাড়বে।

আদৎ কথা চিঠি পাওয়াটা। তুমি সেই আশা, নিতান্ত ছেলেমানুষ দেখি এই সেদিন যাকে, সে এখন বি.এ ছাত্রীর মা। নিজে বাড়িতে পড়িয়ে তাকে মানুষ করেছ এটা সত্যিই বাহাদুরী। তুমি যাই বল না কন, এই পঁচিশ বছর পড়িয়ে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ডিগ্রী পাবার পর থেকে শিক্ষা আরম্ভ হয়। আমরা শিক্ষকরা, নিজেরা পড়ি না, পড়া ভাল বাসি না, পড়াতে জানি না। অতএব, কোনো অনুষ্ঠান থেকে কিছু প্রত্যাশা নেবো না। তবে বন্ধু সংসর্গে চোখ খুলে যাবে তোমার মেয়ের, যার বড়োই প্রয়োজন আছে। তোমাকে যখন দেখি, তোমর চোখ দুটো বড়ই ছিল, খোলা ছিল না। এখন নিশ্চয় খুলেছে।

আমার ছেলে, কুমার, এইবার M.A. Final পড়ছে। তারও বয়স অল্প, ১৮ বৎসর পাঁচ মাস। তোমাদের ভাল লাগবে। অর্থাৎ আমার মতন নয়। পড়াশুনায় মন্দ নয়, ভালই বলা চলে। বই ভালোবাসে, তবে বয়সের তুলনায় মাথা ঠাণ্ডা।

ভাল কথা, তোমার ছেলে বয়সের ২/৩টি চিঠি এখনও আমার কাছে রয়েছে। মাত্র মাস দুই আগে আবার পড়লাম। বেশ লাগল। মোদ্দা কথা, তোমার চিঠি পেতে আমার লোভ আছে। যদি অসুবিধা না হয়, লিখো। যথাসম্ভব উত্তর পাবে। তবে তোমার ইদানীংকার টুকরো লেখা পড়ে বিশ্বাস হয় না যে মতের মিল হবে। ইতিমধ্যে আমিও অনেক বদলেছি। আমার শেষ নভেল 'মোহনা' পড়েছ? আমার কাছে নেই, নচেৎ দিতাম। আজকাল বাংলা লেখা একদম বন্ধ। কি ধরণের বই আজকাল বেশী পড়ছ? আমি যা পাই তাই পড়ি। তবে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসই বেশী। কি ভাবছ আজকাল?

জেনারাল প্রিন্টার্সদের চিনি না। তবে নামই শুনেছি। পার যদি উত্তর দিও।

ইতি

ধূর্জ্জটি প্রসাদ

১৭/৭

আশালতাকে লেখা সুবোধ কুমার ঘোষের পত্র[৩৮] —

পরম শ্রদ্ধেয়া,

আশাপুরী দেবী সমীপেষু,

শুনে বিস্মিত হবেন আমি যখন অমিতার প্রেমে মুগ্ধ হই, তখন আমার বয়স বেশী নয়, মাত্র একুশ বছর। সবে পাটনার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে লোহা পিটিয়ে, কাঠ চিরে ইট কাঠের মজুর বনছি।

পিতৃদেব ছিলেন খুব কড়া জাতের মানুষ; তিন বললেন এখন আগে পরীক্ষা ভাল ভাবে পাশ করে বের হও, তারপরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যত ইচ্ছে প্রেম কোরো। মনের দুঃখে ঠিক করবার, না ঃ এ দেশে আর থাকিব না। কুড়িয়ে কাড়িয়ে গোটা আটত্রিশ টাকা সংগ্রহ করে ঠিক করলাম মালবাহী জাহাজে রেঙ্গুন পালিয়ে গিয়ে সেগুন কাঠের ব্যবসা করব মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।

কিন্তু বিধি হল বাম, আরে রামরাম গিয়েছিলাম বাসুয়াড়ী গ্রাম, ধেয়ে এল পাটনা তার বার্ত্তা (

সেদিন বোধ হয় বার্ত্তাকুভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল) — হুকুম পেয়ে ছুটে এলাম কলকাতা। আমার স্নেহশীলা কাকীমা মোনালিসার মত হঠাৎ হেসে বললেন, ''তোমার ব্যবস্থা হয়েছে। আর বর্ম্মা পালাতে পারবে না শরৎচন্দ্রের মত। টাকা বাজেয়াপ্ত।

কথা আর বাড়াবো না। ৮ই ফাল্গুনে দেখা হ'ল এক অপরিচিতা মানবীর সঙ্গে (ষোড়শী)। বিবিধ বিধানে হ'তে হল ঘোর সংসারী। চিঠিটা শেষ করি ধৈর্য্যে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে। আমার জীবনে সেই মহিয়সী নারী (যাঁকে আমি বলি 'একমাত্র স্ত্রী') এনে দিলেন হিমালয়ের তুষার শুভ্রতা (তিনি আপনাদের শতবার্ষিকী মহোৎসবের প্রেসিডেন্ট প্রভাতের মধ্যমা শালিকা — এখন বড়দিদির পরিচর্য্যায় ব্যস্ত বারাসতে)।

তাই পেলাম আপনাদের দেখা
শেষ করিলাম হেলাফেলা লেখা
আসিয়া ভাগলপুরে
চিরকালের ভবঘুরে।
ইতি —
not yet নিরাশা
শ্রী সুবোধ কুমার ঘোষ (৭০)

বুদ্ধদেব বসু আশালতার লেখার স্টাইল পছন্দ করতেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন —

''আশালতার লেখার আমি খুব ভক্ত; ওঁর প্রবন্ধ আমি পেলেই পড়ি, এবং পড়লেই খুশি হই। জয়ন্তী উৎসবে এন্তার রাবিশের মধ্যে আশালতার লেখা সেই বিরল দু'একটির মধ্যে স্থান পায় যা পড়বার যোগ্য। ... উনি হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র — অন্ততঃ লেখায় যাঁদের পরিচয় পাই - যিনি বুদ্ধিতে পুরুষের সমকক্ষ। ওঁর লেখা পড়ে কখনো মনো হয় না মেয়ের লেখা পড়ছি। ... ওঁর বাঙলা স্টাইলও চমৎকার — আর সেটাই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে।''[৩৯]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্র বিনিময় করে রবীন্দ্রনাথের স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন আশালতা সিংহ। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র বিনিময়ের নিদর্শন আমরা পাই পৌষ, ১৩৯৪-তে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রবীক্ষা' (রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের ষান্মাসিক সংকলন)-তে প্রকাশিত পত্রাবলী থেকে। এতে আশালতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মোট ছয়খানি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা আশালতার মাত্র একখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় স্বল্প হলেও আশালতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি পড়লে অনুমান করা যায় যে এই লেখিকার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কী সুগভীর স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধার মনোভাব ছিল বিশেষত প্রথম পত্রটিতে

যেটির আয়তন ‘রবীন্দ্রবীক্ষা’র ১২ পৃষ্ঠা, যেটি পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মর্যাদা পেয়েছে।

১৭ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই ‘নারী’ নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন আশালতা যেটা দিলীপকুমার রায় (দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র) কলকাতায় নিয়ে যান এবং ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশ করেন ১৩৩৫, বৈশাখ সংখ্যায় (এপ্রিল ১৯২৮)। সেই প্রবন্ধটি দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে দিলে সেটা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ আশালতাকে যে পত্র লেখেন ১৫ বৈশাখ, ১৩৩৫ তারিখে সেটাই উপরে উল্লিখিত প্রথম পত্র এবং সেটি ‘নারীর মনুষ্যত্ব’ নামে বিচিত্রা পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধরূপী পত্রটির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে নবীনা লেখিকার প্রতি প্রবীণ কবির অসাধারণ স্নেহের প্রকাশ। পত্রের শুরুতেই আশালতার রচনা শক্তিকে অসামান্য স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

‘‘কল্যাণীয়াসু,

মন্টুকে যে চিঠি লিখেচ দেখেচি। তাতে তোমার অসামান্যতা প্রকাশ পেয়েচে। তোমার চিন্তা স্বচ্ছ ভাষা অনাবিল।

‘নারী’ বলে তোমার প্রবন্ধটি আমার হাতে পড়েছে। এই বিষয়ে অনেক বাঙালি মেয়ে আজকাল লিখতে বসেছেন। সে সব লেখায় মুদ্রাদোষ অত্যন্ত বেশি। তাঁদের লেখা অশান্ত, তাতে উদ্দীপনা কম উত্তেজনা বেশি। আলোকের চেয়ে দাহ বেড়ে উঠেছে। তোমার লেখায় আত্মশ্রদ্ধা গাম্ভীর্যের শান্তি, এতে কলহের ঝাঁজ পাওয়া গেল না।’’[৪০]

অর্থাৎ একই সঙ্গে তাঁর পত্ররচনায় অসামান্যতার প্রকাশ, চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাষার অনাবিলতা এবং প্রবন্ধের মধ্যে ‘আত্মশ্রদ্ধ গাম্ভীর্যের শান্তি’-র পরিচয় লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ যা লেখিকার অসামান্য কৃতিত্বের নিদর্শন তো বটেই, সেই সঙ্গে লেখিকার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসামান্য স্নেহের প্রকাশও অবশ্যই একথা মানতেই হয়।

এরপরে ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী এই প্রবন্ধকার পত্রে আশালতার রচনার বিশ্লেষণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ, আর সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, নিজের মতামত।

রবীন্দ্রনাথের লেখা মোট ৬ খানি পত্রের রচনাকাল বৈশাখ ১৩৩৫ (মে, ১৯২৮) থেকে চৈত্র, ১৩৪৫ (৬/৪/১৯৩৯) অর্থাৎ মোট ১০ বৎসরকাল। মৃত্যুর মাত্র ২ বৎসর ৪ মাস লেখা শেষ পত্রখানিতেও আশালতার পাঠানো গ্রন্থপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে — কিন্তু সেই বইটি কোন বই, সেটি পড়ে তাঁর কতটা ভালো অথবা মন্দ লাগল তার বিশ্লেষণ পত্রে নেই তবে রচনাটিকে ‘পাকা হাতের লেখা’

বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাতেই বোঝা যায় যে, আশালতার রচনা তুলনামূলকভাবে পরিণত হয়েছ ততদিনে। অবশ্যই স্মরণীয় যে, এই সময় লেখিকার বয়সও ২৮ ছুঁই ছুঁই — কাজেই লেখাতে পরিণতি আসাটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথও সেই পরিণতিকে স্নেহের সঙ্গেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র ও প্রসঙ্গ নির্দেশ —

১) দ্র. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন 'অর্ধাঙ্গী', 'স্ত্রী জাতির অবনতি' রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৩৯

২) দ্র. আশালতা সিংহ, 'সুরের উৎস', ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৭।

৩) দ্র. তদেব, পৃ. ৯

৪) দ্র. তদেব, পৃ.১০

৫) দ্র. ঐ

৬) দ্র.তদেব, পৃ.৭০

৭) দ্র. তদেব পৃ.৭৫

৮) দ্র.তদেব, পৃ. ৮৬

৯) দ্র.তদেব, পৃ. ৫২

১০) দ্র.তদেব, পৃ. ৭৫

১১) দ্র.তদেব, পৃ. ৬

১২) দ্র.তদেব, পৃ. ৫

১৩) দ্র.তদেব, পৃ. ৫২

১৪) দ্র. ঐ

১৫) দ্র.তদেব, পৃ. ৭

১৬) দ্র.তদেব, পৃ. ৯

১৭) দ্র.তদেব, পৃ. ১১

১৮) দ্র.তদেব, পৃ. ৭৬

১৯) দ্র.তদেব, পৃ. ৮৯

২০) দ্র. আশালতা সিংহ 'পুনরাবৃত্তি', ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৯২

২১) দ্র.তদেব, পৃ. ৯৮

২২) দ্র.তদেব, পৃ. ১০১

২৩) দ্র.তদেব, পৃ. ১১৪

২৪) দ্র.তদেব, পৃ. ১৩৮

২৫) দ্র. ঐ

২৬) দ্র.তদেব, পৃ. ১৫০

২৭) দ্র.তদেব, পৃ. ১৫১

২৮) দ্র. ঐ

২৯) দ্র.তদেব, পৃ. ১১০

৩০) দ্র.তদেব, পৃ. ৯২

৩১) দ্র.তদেব, পৃ. ১৪০

৩২) দ্র.তদেব, পৃ. ১৫০

৩৩) দ্র.তদেব, পৃ. ১৩৮

৩৪) দ্র.তদেব, পৃ. ১৫১

৩৫) দ্র.তদেব, পৃ. ১৫২

৩৬) দ্র. বীরভূমের শিক্ষানুরাগী শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩৭) দ্র. ঐ

৩৮) দ্র. শম্পা সিন্‌হা ঃ আশালতাসিংহের 'সৃষ্টিলোক আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ', আশাদীপ ১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৪০৫

৩৯) দ্র. 'সংবাদ সাহিত্য' ঃ 'শনিবারের চিঠি', বৈশাখ ১৩৪০ পৃ. ১৯৯

৪০) দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'নারীর মনুষ্যত্ব', 'বিচিত্রা পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।